প্রথম প্রকাশ
১৩৬৬

প্রকাশক :
মণ্ডল বুক স্টোর্স
রাঁচি
বিহার

মুদ্রক :
শ্রীঅজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা ৭০০০০৯

ধলভূমের লোকগীতি (দ্বিতীয় খণ্ড : মকর)

'কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ'—বাংলার এই পরিচিত প্রবাদটির অর্থ শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন। কিন্তু সর্বনাশের বিপরীতে পৌষমাসের সর্ব-প্রাপ্তির তাৎপর্যটি একমাত্র কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থাতেই সুপরিস্ফুট এবং পূর্ণরূপে অনুভবগম্য। পৌষ মাস কৃষিজীবী মানুষের কাছে পূর্ণতার প্রতীক, —'ডালা যে তার ভরেছে আজ সোনার ফসলে।' পৌষ মাস তাই প্রাচুর্যের সেই স্বর্ণলগ্ন, কৃষিজীবী মানুষের কাছে যা সংবৎসরে[১] একবারই আসে। ধলভূমের আদিম মানুষ আজও কৃষিজীবী। শুধু তাই নয়, এখানের রুক্ষ মাটি বছরে একবারের বেশী ফসল দিতে একান্তই অনিচ্ছুক ও অক্ষম। ধানই এখানের একমাত্র ও প্রধান সম্পদ। সে ধানও আবার একান্তরূপেই আকাশের প্রসন্ন দাক্ষিণ্যের মুখাপেক্ষী। 'চাষ ন বাস টুরুই বেঙের আশ'—ধলভূমের এই প্রবাদটি এখানের মানুষের সুদীর্ঘকালের তিক্ত বিরক্ত অভিজ্ঞতারই সংহত সংযত রূপচিত্র। 'টুরুই বেঙ' অর্থাৎ কোলা বেঙের ডাক যতক্ষণ না ধ্বনিত হচ্ছে মাঠে-ঘাটে, ততক্ষণ এখানে চাষবাসের আশা দুরাশা মাত্র। বলাবাহুল্য যে, প্রবল বর্ষণের পটভূমিকাতেই কোলা বেঙের কণ্ঠে জাগে অবিশ্রান্ত শব্দের ঝঙ্কার। শুনেছি দর্দুর বক্তা হলে কোকিলের কণ্ঠস্বর নীরব হয় আহত অভিমানে, কিন্তু অনুরূপক্ষেত্রে এখানের মানুষের মন-ময়ূরী আনন্দে ডানা মেলে মাঠ-ভরা ফসলের সুনিশ্চিত প্রত্যাশায়। সেই প্রত্যাশার নদীতে প্রাপ্তির জোয়ার নামে পৌষ মাসে। ধলভূমের মানুষের কাছে, পৌষ তাই, সুখের মাস, বছরের সেরা এবং শেষ মাস।

পঞ্জিকার হিসেবে বৈশাখে বছর শুরু, শেষ চৈত্রে। ধলভূমে বছর শেষ হয় পৌষ মাসে। মুনিস, কামিন, বাগাল, কামার অর্থাৎ কৃষিকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত সহযোগী মানুষজনদের সঙ্গে কৃষকের সাংবাৎসরিক চুক্তি তামাদি হয়ে যায় পৌষ সংক্রান্তির দিনে। মকরদিনের সকালে নব বস্ত্র ও পিঠার উপহার নিয়ে বিদায় নেয় মুনিস, কামিন, বাগালের দল। সামনের বছরে কাজ করার জন্য তাদের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করতে হয়। সেই চুক্তি কার্যকর হয় পয়লা মাঘ থেকে।

১। এখানের ভাষায় 'সম্বছরে'।

পৌষ সংক্রান্তির দিনটিই মকর ; কিন্তু মকরের প্রকৃত সূচনা অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে। আসল পূজার পূর্বে যেমন মহালয়া, অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে তেমনি মকরের মহড়া। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি এখানে 'ছট[1]মকর' নামে খ্যাত। টুসুর স্থাপনা হয় অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির সন্ধ্যায়, বিসর্জন হয় পৌষ সংক্রান্তির সকালে। ধলভূমে অবশ্য টুসু বিসর্জনের পালা চলে বেশ কয়েকদিন ধরে ; পৌষ সংক্রান্তিতে যার শুরু তার শেষ হয় মাঘের প্রথম সপ্তাহে। মকর দিন থেকেই নদীর ঘাটে ঘাটে মেলা বসতে শুরু করে। অনেকগুলি মেলা অনুষ্ঠিত হয় মাঘের প্রথম সপ্তাহে। এই সব মেলায় মানুষের সঙ্গে সঙ্গে টুসুও আসে। গ্রামের নদীর ঘাটে টুসুকে না ভাসিয়ে বহুজনের সমাগমে মুখরিত পরব[2] ঘাটে টুসুকে বিসর্জন দেবার বাসনা বহুজনের। তাছাড়া আনন্দের মুহূর্তগুলিকে বিলম্বিত করার বাসনাও মানুষের চিরন্তন। যতক্ষণ টুসু ততক্ষণই মকর। ডেনমার্কের রাজপুত্রকে বাদ দিয়ে যেমন 'হ্যামলেট' নাটকটির কথা ভাবা যায় না, টুসুকে বাদ দিয়েও তেমনি ধলভূমের মকর পরবের কথা চিন্তা করা যায় না। সেই সূত্রেই টুসু-ভাসানের বাজনা বাজে মকরের পরবর্তী দিনগুলিতে বিভিন্ন নদী-ঘাটে অনুষ্ঠিত পরবের উন্মাদনাময় পরিবেশে। নদীর জলে আছড়ে পড়ে টুসুর মূর্তি—এই অঞ্চলের মানুষের সাংবাৎসরিক আনন্দের জীবন্ত প্রতিমূর্তি ; তটে জাগে জন-সমুদ্রের জোয়ার, বাতাস মাতাল হয় মাদলের তালে, তরুণ তরুণী মাতাল হয় গীতের ছন্দে আর মিলনের আনন্দে। স্মরণীয় যে, এই অঞ্চলের পরবগুলি নির্বাধ যৌবনের অবাধ বিহারভূমি। মকর বৎসরের শ্রেষ্ঠ পরব। কৃষিভিত্তিক অর্থ-নীতির প্রাপ্তি এবং প্রাচুর্যের স্বর্ণলগ্নে এর সমাগম। মকর যে পরবের সারাৎসার তার আসল সত্যটা এখানেই। কাজেই এখানে যৌবন আরো চঞ্চল, উন্মাদনা আরো প্রবল, উল্লাস আরো উদ্দাম। নদীঘাটের খোলা মাঠে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম শিখা শুধু আকাশকে রাঙায় না, মানুষের মনকেও রাঙিয়ে দিয়ে যায়।

অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির 'ছট মকর' অভিধাটি অকারণ নয়। কারণ এদিন শুধু টুসুরই স্থাপনা হয় না, মকরের অন্যতম অনুষঙ্গ 'গড়গড়িয়া পিঠা'[3]রও আস্বাদ গ্রহণ করা হয়। "আঘন সাঁকরাইতে গুঁড়ি হাথ, পৌষ সাঁকরাইতে পিঠাভাত"

১। =ছোট।

২। পর্ব>পরব।

৩। পুর দেওয়া চালের পিঠা যা জলের বাষ্পে সেদ্ধ করা হয়।

—ধলভূমের একটি প্রিয় প্রবাদ। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে যে পিঠার আরম্ভ পৌষ সংক্রান্তিতে তার সুমধুর ও সুপ্রচুর পরিসমাপ্তি।

আসলে কৃষিভিত্তিক এই আঞ্চলিক অর্থনীতিতে অগ্রহায়ণ মাসের গৌরব ও গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। এই মাসে চাষীর ঘরের ডালা ভরে মাঠের সোনা-ফসলে। 'আঘন মাস' কথাটি এখানে শুধুমাত্র একটি বিশিষ্ট মাসের সংবাদ দেয় না, অত্যন্ত সুসময়ের ইঙ্গিতটুকুও স্পষ্টভাবেই দেয়। এর বিপরীতে পাই 'ভাদর মাস'-টিকে যা অত্যন্ত দুঃসময়ের তাৎপর্যবাহী। বিদ্যাপতি 'মাহ ভাদরের' দুঃখের কথা শুনিয়েছেন সেটা কিন্তু বিলাসীর দুঃখ, এখানে সেটা বুভুক্ষু মানুষের দুঃখ। তখন ঘরের সব ধান মাঠে, মাঠের কাজও শেষ, পাকা ধানের স্বপ্ন তখনও দানা বাঁধে নি। কাজেই ভাদর মাসে কাজ জোটে না, পুরানো সঞ্চয়ও সমাপ্ত, অর্ধাশন এবং অনশনই তখন অধিকাংশ মানুষের ব্যতিক্রমহীন বিধিলিপি। অগ্রহায়ণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক অর্থনীতির চিত্রটি সম্পূর্ণ বদলে যায়। দারিদ্র্য পর্যুদস্ত হয় শ্রী ও সম্পদের হাতে। মাঠের ধান ঘরে আসতে শুরু করে। দিন মজুর কাজ পায়। চাষীর শূন্য ঘর পূর্ণ হয়। নিদারুণ দারিদ্র্যের ক্ষত চিহ্নগুলি অগ্রহায়ণের আশীর্বাদে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। দেহে লাবণ্য আসে, প্রাণে আনন্দ। 'আঘন মাসে চুটিয়ারও সাতটা বউ'—এখানের আর একটি শ্লেষগর্ভ প্রবাদ। অগ্রহায়ণের আশীর্বাদপুষ্ট হঠাৎ-বড়লোকী-ঠাটকে বিদ্রূপ করা প্রবাদটির লক্ষ্য হলেও এর লক্ষণার্থে অগ্রহায়ণের শ্রী ও সম্পদের অসংশয়িত স্বীকৃতি অবশ্যই সোচ্চার। ভাদরে যে একটি বৌকে ভাত দিতে পারে নি, আঘনে সেও সাতটি বৌকে ভাত দেবার ক্ষমতা রাখে। ভাদরে যে পেট সামান্য দুটি ভাতের জন্য কাঙাল ছিল অগ্রহায়ণ তার সম্মুখে রসনালোভন পিঠার থালা তুলে ধরে। স্মরণীয় যে, মকর পরব একই সঙ্গে টুসু-পরব এবং পিঠা-পরব। একটিতে মনের উল্লাস, অপরটিতে দেহের। দেহের উল্লাসে শুধু পিঠা নেই 'লইতন কাপড়' (=নূতন কাপড়) ও আছে। নববস্ত্র পরিধান মকর পরবের প্রথম ও প্রধান শর্ত। মানুষ ঢেঁকি বন্ধক দি করিও মকরে লইতন কাপড় পরূহে'[১]—এখানের পরিচিত প্রবাদ, দুর্মর সংস্কার ও দ্বিধাহীন বিশ্বাস। এই অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ—ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে—মকর দিনে নূতন বস্ত্র পরিধান করে। ব্যতিক্রম বোধহয় একমাত্র কাপড়ের ব্যবসায়ীরা

১। =মানুষ ঢেঁকি বন্ধক দিয়েও মকর দিনে নূতন কাপড় পরে।

যাদের সারাদিন কেটে যায় খদ্দের সামাল দিতে এবং সেই পুরানো কথাটি প্রমাণ করতে যে, 'ময়রা মিষ্টি খায় না'[২]

মকরের উদ্‌বোধন অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে, বোধন চাঁউড়ির দিনে। পৌষ সংক্রান্তির পূর্বের দিনটিকে বলে 'বাঁউড়ি', বাঁউড়ির পূর্বদিনটি 'চাঁউড়ি' নামে খ্যাত। চাঁউড়ির পূর্বদিনটিকে 'চাল ধুয়া'[৩] বলা হয়। অর্থাৎ চালধুয়ার পরের দিন চাঁউড়ি, চাঁউড়ির পরের দিন বাঁউড়ি, বাঁউড়ির রাত ভোর হলেই মকর। চালধুয়ার দিনে চাল ধোওয়া হয়, চাঁউড়ি দিনে সেই চাল কুটে 'গুঁড়ি'[৪] তৈরী হয়। স্মরণীয় যে, চাঁউড়িকে গুঁড়িকুটার দিন বলেও অভিহিত করা হয়। বাঁউড়ি দিনে সেই চালের গুঁড়ি থেকে পিঠে বানানো হয়। পরের দিন অর্থাৎ মকর দিন সেই পিঠেকে আয়েস করে খাবার দিন। মকর প্রকৃত অর্থেই পিঠা পরব।

অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে সাংবাৎসরিক আনন্দোৎসবের সেতারে প্রথম সুর বাঁধা হয়েছিল, সেই সুর দ্রুততালে বেজে ওঠে চাঁউড়ি-দিনে, তারই জয়জয়ন্তী মকর দিনে।

মকরের পূর্বদিনটি অর্থাৎ বাঁউড়ি দিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এইদিনে "বাঁউড়ি বাঁধা" এখানের মানুষের একটি অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠান। এইদিনে ঘর গৃহস্থালির যাবতীয় জিনিসপত্রকে বিশেষতঃ কৃষিকর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুসমূহকে[৫] নূতন 'পুয়াল'[৬] দিয়ে বাঁধা হয়। পিঠের হাঁড়িতেও বাঁউড়ি বাঁধা হয়। সে বাঁধন খোলা হয় পরদিন সকালে মকরস্নান করে এসে মকরজল ছিটিয়ে।

বাঁউড়ি-বাঁধা অনুষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য অমঙ্গলের হাত থেকে ঘর-গৃহস্থালির সব কিছুকে রক্ষা করা। বাঁউড়ি দিনে অমঙ্গল সৃষ্টিকারী শক্তিসমূহ অত্যন্ত সক্রিয় বলেই এরূপ শক্ত বাঁধনের ব্যবস্থা। এই বাঁধন লক্ষণের গণ্ডীর ন্যায় শক্তিশালী বলেই এখানের মানুষের বিশ্বাস।

ধলভূমের লোকায়ত জীবনে মধ্যযুগীয় সংস্কার এখনো সদর্পে বিরাজমান।

২। ধলভূমে এর তুলনীয় প্রবাদ "কেওট (<কৈবর্ত) মাছ নাই খায়"।

৩। =চাল ধোওয়া [ধলভূমে আদি ও কার >উ-কার ; যেমন, তোমার >তুমার]

৪। =তণ্ডুলচূর্ণ

৫। যথা—'গোহাইল' (<গোশালা), লাঙ্গল ইত্যাদি।

৬। =খড়।

ভূত, ডাইনী, সাতবহনী[১] ইত্যাদিরা এখনো এখানের পথেঘাটে অকুতোভয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে এবং তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য এখানের মানুষের প্রয়াসের অন্ত থাকে না। ডাক্তার নয়, সাতবহনী থেকে সর্পাঘাত সব কিছুতেই এখানে 'গুণী'[২] এবং ওঝাদের নাম ডাক বেশী। ডাইনী সন্দেহে কোনো কোনো স্ত্রীলোককে প্রচণ্ড প্রহার করে মেরে ফেলা হয়েছে, এমন নজীরেরও অভাব নেই এখানে। বাঁউড়ি-দিনে, পিঠার লোভেই কিনা কে জানে, এই ডাইনীরা নাকি এদিন প্রত্যেক বাড়িতে যায়। এদের স্পর্শে মৃত্যু সুনিশ্চিত। কাজেই এদিন রাত্রে শোবার সময় পায়ে 'খাঁটি তেল'[৩] মেখে শুতে হয়। খাঁটি তেল অশুদ্ধ। অশুদ্ধ বস্তুর স্পর্শে শরীরও অশুদ্ধ হয়। ডাইনীরা নাকি অশুদ্ধ বস্তু স্পর্শ করে না।

অরণ্য পর্বত বেষ্টিত এই জনপদে সারা শীতকাল ধরে রাত্রে শেয়ালের ডাক শোনা যায়। বাঁউড়ির রাত্রে শেয়ালের ডাক কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গভীরতর তাৎপর্যসূচক। এদিন রাত্রে যদি চারপ্রহরেই শেয়াল ডাকে তাহলে পরের বছর ষোল আনা আবাদ হয়, তিন প্রহর ডাকলে বার আনা, দু প্রহর ডাকলে উৎপন্ন

১। =সাত বোন। [লোকবিশ্বাস এই যে, এরা সাত বোন একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায় এবং নির্জন পথে-প্রান্তরে এরা মানুষের প্রাণবধ করে। অবিবাহিত তরুণ ছেলেরাই এদের আসল লক্ষ্য। তরুণ ছেলেটিকে এরা ধরে নিয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে কাউকে বিয়ে করতে বলে। তরুণটি যদি ভাগ্যক্রমে সর্ব-কনিষ্ঠা বোনটিকে বেছে নেয় তাহলে সে বেঁচে যায়। সেক্ষেত্রে অপরাপর বোনেরা তাকে আক্রমণ করতে পারে না। সম্পর্কে বাধে (তরুণটি তাদের বোনের বর, কাজেই তারা তার গুরুজন এবং সে তাদের আদরের 'জামাই' বলে)। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তরুণটি যদি বড় বোনদের মধ্যে কাউকে বেছে নেয় তাহলে শ্যালিকাদের মুষ্টিযোগে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত। যতক্ষণ না তরুণটি এদের কাউকে বিযে করতে রাজি হয় ততক্ষণ তাকে এরা আটকে রাখে।]

২। =যে গুণমন্ত্র জানে।

৩। সর্ষে তেল এখানে খাঁটি তেল নামে পরিচিত। একদা ছিল খাঁটি সর্ষে তেল, তার থেকে সর্ষে বাদ পড়ে সংক্ষেপিত হল খাঁটি তেল, বিশেষণ বিশেষ্যের কার্যভার গ্রহণ করল। আজ খাঁটি সর্ষে তেল দুষ্প্রাপ্য—অন্ততঃ এখানের গ্রামবাসীদের নিকট ; কিন্তু সর্ষে তেল যে একদা খাঁটি ছিল তার প্রমাণ ও পরিচয় 'খাঁটি তেল' কথাটির মধ্যেই থেকে গেছে। সে প্রমাণ লুপ্ত হবার সম্ভাবনা কম। কারণ সর্ষে তেলের চেয়ে 'খাঁটি তেলের' প্রভাব এবং প্রতিপত্তি অনেক বেশি।

ফসলের পরিমাণ অর্ধেক কমে যায় ; আর যদি মাত্র এক প্রহরে শেয়ালের ডাক শোনা যায় তাহলে পরের বছরটি অত্যন্ত দুঃসময়, কেননা সেক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ চার আনার বেশী হবে না। আর যদি রাত্রের কোনো প্রহরেই শেয়াল না ডাকে ? না। সে কথা ভাবতেও এখানের মানুষ ভয় পায়।

এই অঞ্চলের মানুষ বিশ্বাস করে যে, বাঁউড়ি দিনে সব ইঁদুর গর্তে প্রবেশ করে। এতদিন তারা গর্তের বাইরে ছিল, কারণ ক্ষেতে খামারে ধানচালের ছড়াছড়ি ছিল। ক্ষেতের ধান খামারে এল, খামারের ধান ঘরে ঢুকল। কাজেই ইঁদুরগুলি আর বাইরে থেকে করবে কি ? তারা নিজেদের গর্তে প্রবেশ করে। আসলে চাষীর ক্ষেত খামারের যতটা সম্ভব সর্বনাশ করে এবার তারা বাসা বাঁধে ঘরের ভিতে—পুড়া[১] বা ডিলি[২]র নীচে ; ঘরের মেজেতে, দেওয়ালে গর্ত খুঁড়ে চাষীর কষ্টার্জিত সম্পদ চুরি করে নিজেদের গহ্বর পূর্ণ করে। লোক-বিশ্বাসটি ভ্রান্ত নয়, কিন্তু ইঁদুরও অভ্রান্ত। প্রাণীজগতে, এক শ্রেণীর মানুষের পরে, সবচেয়ে বড়ো পুঁজিপতি হল এই ইঁদুর। পরান্নেই তার প্রতিপালন, পরের উপার্জিত সম্পদেরই সে সুচতুর দাবীদার, পরের ভাণ্ডার শূন্য করে নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করাই তার ব্রত ও বিধান। এত সব জীব ছেড়ে এই বিশেষ জীবটিকে একটি বিশেষ দেবতা কেন যে বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তার রহস্যটি পরিষ্কার হয় গাঁয়ে-ঘরের ইঁদুরগুলির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করলে। রবীন্দ্রনাথ একবার পরিহাস করে বলেছিলেন যে, সিদ্ধিদাতা গণেশের আরাধনা করে তিনি শেষ পর্যন্ত লাভ করেছিলেন ছিদ্রদাতা মূষিকের সাক্ষাৎ। বাণী-সাধক রবীন্দ্রনাথ বড়লোক হওয়ার মূলমন্ত্রটি মুখস্থ করেছিলেন কিন্তু মর্ম বুঝতে পারেন নি। ছিদ্রদাতা মূষিকের কৌশল যাঁর জানা নেই সিদ্ধিদাতা গণেশের আশীর্বাদলাভে তিনি নিতান্তই অক্ষম।

বাঁউড়ির রাত পোহালেই মকর—সেই পরম কাম্য ও রমণীয় দিনটি, ধলভূমের

১। পুয়াল (= খড়) পাকিয়ে 'বড়্' তৈরী করে তা দিয়ে ধান বা চালকে বেঁধে রাখা।

২। বাঁশের কঞ্চির তৈরী বৃহদাকার ধান (বা চাল) রাখার পাত্র। এক একটি 'ডিলি'তে কুড়ি মন থেকে একশ, দেড়শ মন ধান (বা চাল) রাখা যায়। ধলভূমে 'মরাই'-এর চল নেই। এখানে পুড়া এবং ডিলিতেই ধান রাখা হয়। যে চাষী 'ডিলি বসায়' অর্থাৎ ডিলিতে ধান রাখে সে অবশ্যই সম্পত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয়। 'ডিলি বসানো' কথাটি ইডিয়ম রূপেও ব্যবহৃত হয়, অর্থ 'বড়লোক হওয়া'।

আবালবৃদ্ধবনিতা যে দিনটির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করেছিল সম্পূর্ণ একটি বছর ধরে। যে দিনটির আগমনী সুর ধ্বনিত হয়েছিল তিরিশ দিন পূর্বে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিনে।

তরা পিঠা কাপড় যগাড়[১] কর
আসছে মকর দুদিন সবুর কর।

মকর এই পিঠা-কাপড়ের উৎসব। একটি মকর গীতে শুনি—

মকর দিনে করইব নিমন্ত্রণ
তুই খাবি ল মনের মতন।
পিঠা দিব কাপড় দিব
মদ দিব এক বতল।[২]
মকর দিনে করইব নিমন্ত্রণ॥

মকরের এই আমন্ত্রণ লিপিতে এই উৎসবের প্রতিটি আয়োজনের পরিপূর্ণ তালিকা সঙ্গীতের অঞ্জলিতে তুলে ধরা হয়েছে। সঙ্গে আনন্দঘন আমন্ত্রণের আদিম আবেশ ও মধুর আকাঙ্ক্ষা।

মকরদিনে সকলেই নদী বা কোনো নির্দিষ্ট জলাশয়ে গিয়ে স্নান করে, নূতন বস্ত্র পরে, বাড়িতে এসে তিলের লাড্ডু ও গড়গইড়্যা পিঠে খায়। টুসু ভাসানোর গীতে, মাদলের তালে এবং সার্বজনীন স্নানোৎসবের অপূর্ব সুষমায় নদীঘাট তরঙ্গিত হয় রূপে-রসে-দৃশ্যে-গানে। রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করে বলা যেতে পারে যে, ধলভূমের মকরস্নানের দৃশ্য যে দেখেনি সে ধলভূমের সৌন্দর্যকেও প্রত্যক্ষ করেনি। অনশন ও অর্ধাশনে দগ্ধ ও দুঃস্থ মানুষগুলির কণ্ঠে যে কত সুর, দেহে-মনে যে কতখানি আনন্দের কোলাহল সৃষ্টি হতে পারে 'মকর'ই বোধ হয় তার একমাত্রী সাক্ষী।

স্মরণ রাখতে হবে যে, টুসু মূলতঃ একটি শস্যোৎসব। টুসু পাতার আনুষঙ্গিক উপচার ও উপাদানগুলি সেই শস্যোৎসব সুস্পষ্ট স্মারক। টুসুর মধ্যে সেই আদিম শস্যোৎসব সাকার হয়ে এখানের মানুষের আনন্দ বেদনার শরিক হয়েছে। কুমারী মৃত্তিকা আর কুমারী কন্যা একাকার হয়েছে এবং শস্যোৎসব আনন্দ-উৎসবে পরিণত হয়েছে। কুমারী কন্যাদের হাতে টুসু পূজার অধিকারটুকু এখনো আছে, কিন্তু গীতের দখল যৌবনের হাতে চলে চলে গেছে। টুসুকে

১। =যোগাড়
২। =বোতল।

উপলক্ষ করে তরুণ-তরুণীদের মনের ও মুখের বাধা ও বাঁধন নিঃশেষে খসে পড়েছে। টুসু আজ শুধু আনন্দ-উৎসব নয়, যৌবনেরও মহোৎসব।

এ দিন যে নূতন কাপড় পরার সুযোগ পায় না সে হতভাগ্য। টুসু গীতে কোনো একটি অজ্ঞাতনামা হতভাগিনী রমণীকে আত্মহত্যা করে নিদারুণ দুঃখ ও অবহেলার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যে রমণীটি এমন দিনেও নূতন সায়া-শাড়ি পরার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আত্মহত্যার বেদনা থেকে মকর দিনে নূতন কাপড় না পাওয়ার আঘাত যে অনেক বেশী অসহনীয় সেকথা এখানের দয়িতা ও দুহিতাগণ দৃঢ়কণ্ঠে স্বীকার করবেন।

ও তুই লে[১] ল গলায় দড়ি
এত বড় পোষ পরবে মিলল না সায়া-শাড়ি।

মকরদিনে সাধারণতঃ কেউ ভাত খায় না। আসলে ভাত রান্না করার প্রয়োজনই থাকে না। পিঠের পর্যাপ্ত আয়োজনে পরিতৃপ্ত থাকে মানুষ। গড়-গইড়্যা পিঠে মকরদিনের বিশিষ্ট পিঠে হলেও ধলভূমে তার সঙ্গে আর একটি পিঠেও প্রস্তুত করা হয়। চালের 'গুঁড়ি'র সঙ্গে গুড় মিশিয়ে সর্ষে তেলে (অথবা বাদাম তেলে, ক্বচিৎ ডালডায়) ভাজা গুড় পিঠে—অত্যন্ত মুখরোচক কিন্তু গুরুপাক। তাছাড়া গড়গইড়্যা পিঠে সম্পর্কে কিছু বিধিনিষেধ থাকার জন্য অনেকের কাছে গুড় পিঠেই মকরের একমাত্র পিঠে। যাদের বংশে সেই বছর কোনো ব্যক্তি মারা যায় তারা সে বছর মকর দিনে গড়গইড়্যা পিঠে প্রস্তুত করতে পারে না। তবে অন্য কেউ যদি তাদের সে পিঠে দেয় তাহলে অবশ্য খেতে বাধা নেই। এই অঞ্চলের মানুষ শুধু যে প্রাণভরে পিঠে খায় তাই নয়, 'টঁকা'-[২]য় ভরে সেই পিঠের তত্ত্বও পাঠায় নিকট-দূরের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে।

মকরদিনে ধলভূমের মানুষ নির্ভয় ও নির্ভার। এ দিন সকলের ছুটির দিন। কামিন,[৩] মুনিস,[৪] বাগাল, ধাঙড়[৫] সকলেই এ দিন কর্মবিরতির উন্মুক্ত অবকাশ

১। =নে (=নাও)

২। বাঁশের কঞ্চির তৈরী পাত্র ('ঠেকা' নামেও পরিচিত)

৩। =স্ত্রী-মজুর

৪। =পুং-মজুর

৫। যে মুনিস সম্বৎসরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে মনিবের গৃহে অবস্থান করে, কাজ করে।

ও আনন্দ লাভ করে। প্রয়োজনের তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত মানুষগুলি কায়িক পরিশ্রমের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করে প্রিয়জনের সান্নিধ্যে বেঁচে থাকার অসহ্য সুখ অনুভব করে পরবশাইলে,[১] নদীঘাটে, পরিতৃপ্ত গৃহাঙ্গনে।

মকরের পরের দিনটি আইখান দিন—অত্যন্ত পূত পবিত্র দিন। ধলভূমের পঞ্জিকায় নূতন বৎসরের সূচনা এদিন থেকেই। পয়লা মাঘ থেকেই নূতন কৃষি বছরের শুরু। এখানের মানুষ সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে যে, এ দিন যে কর্মের সূচনা করা হয় সে কর্মে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। তাই এখানের মানুষ তাদের নিজ নিজ প্রিয় কর্মগুলির শুভারম্ভ করে এই শুভদিনে। চাষী মাটিতে কোদালের চোট দেয়, শিকারীরা শিকারে বেরোয়, পথিক শুভযাত্রা করে। কোনো কারণে যদি মাটিতে চোট দেওয়া সম্ভব না নয়—অর্থাৎ বৃষ্টির অভাবে মাটি যদি শুকনো থাকে তাহলে গোবর-কুড়ে কোদালের চোট দিয়ে চাষী নূতন বছরের কৃষি-কর্মের শুভ মহরৎ করে থাকে। ব্যবসায়ীরা নূতন খাতা খোলে পয়লা বৈশাখে, কৃষকের নূতন খাতা খোলার দিন এই আইখান দিন।

আইখান দিনে এখানের মানুষের একটি প্রিয় অনুষ্ঠান 'ভেজা[২]বিঁধা'—যা প্রাচীন দলবদ্ধ শিকারের সুস্পষ্ট স্মৃতিবাহী। একদা অরণ্যচারী মানুষ দলবদ্ধ-ভাবে শিকারে বহির্গত হত, যার তীর লক্ষ্যভেদে সমর্থ ছিল বিজয়ীর বরমাল্য তারই কণ্ঠার্পিত হত ; সেই হত দলপতি বা নেতা। আদিবাসী সমাজে দলবদ্ধ শিকার এখনো সম্পূর্ণ অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হয়নি বটে কিন্তু কালের বিবর্তনে অরণ্য তার গাছপালা বা পশুপক্ষী হারিয়ে যথেষ্ট রিক্ত হয়ে পড়েছে, শিকারী হয়েছে চাষী, অর্জুন হয়েছে হলধর, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা পরাজিত করেছে লক্ষ্যভেদের নিপুণতাকে। এখন এখানের মানুষের লক্ষ্যভেদের নিপুণতা প্রদর্শনের একটি মাত্র স্থান আইখান দিনের উক্ত ভেজা-বিঁধা অনুষ্ঠান।

গ্রামের উন্মুক্ত মাঠে তীরন্দাজেরা হাতে তীরধনুক নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। সম্মুখে বেশ কিছুটা দূরে একটি সজনে বা ঐ জাতীয় কোনো গাছের ডাল পুঁতে রাখা হয়। তার মাথায় থাকে গোবরের ঢেলা। এটাই 'ভেজা' অর্থাৎ টার্গেট। তীরন্দাজেরা একসঙ্গে পর পর তিনটি তীর ছোঁড়ে। যার তীর

১। =পরবক্ষেত্র।
২। =ভেদ্য।

লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হয় সেই এ দিনের সর্বজনসমর্থিত নায়ক (Hero)। তাকে কাঁধে চাপিয়ে 'লায়া'র ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সে পুরস্কার পায় একটি ধুতি, একটি খাসী ও নগদ কিছু অর্থ।

এই আইখান দিনে ভূমিজ-সাঁওতালদের একটি প্রিয় আনন্দানুষ্ঠান 'গাঁড়ি-আশেন' বা বাঁদর নাচ। সত্য মিথ্যা জানিনা, কিন্তু অনেকের কাছেই শুনেছি যে, সারা বছর ধরে মাটি কাটার ফলে মাটির নীচে সুখে বসবাসকারী কেঁচো ইত্যাদি বহুপ্রকার পোকা-মাকড়কে হত্যা করার পাপস্খালনের জন্য এরা আইখান দিন থেকে তিন দিন ধরে ঘরে ঘরে বাঁদরের নাচ দেখিয়ে ভিক্ষে করে। স্মরণীয় যে, অরণ্যচারী এই আদিম মানুষগুলি কায়িক শ্রমে কদাচ বিমুখ নয়, ভিক্ষা-বৃত্তিকে এরা ঘৃণার চোখেই দেখে। এরা ভিক্ষুক সাজে পাপস্খালনের অনিবার্য প্রয়োজনেই।[১] মাটির সন্তানদের সারা বছরই মাটির বুকে কঠিন আঘাত দিতে হয় জীবনধারণের অনিবার্য তাগিদে। ফলে মৃত্যু ঘটে অসংখ্য পোকামাকড়ের— মাটি যাদের জীবন; মাটির বুকেই যাদের সুখের ঘরকন্না। অনিচ্ছাকৃত অপরাধের (?) প্রায়শ্চিত্তের এই রীতিটি বিচিত্র ও অভিনব।

এদের বাঁদর নাচের বাঁদরটি কিন্তু আসল নয়, নকল। খড় দিয়ে বাঁদর বানানো হয়, তাকে জামা-কাপড়ও পরিয়ে দেওয়া হয় এবং তাকেই গান গেয়ে লাঠি দিয়ে নাচানো হয়। বাঁদর নাচের গানগুলি সাঁওতালী ভাষায় 'গাঁড়ী আশেন সেরেঞ'[২]। এমনি দুটি গান- একটি সাঁওতালী ভাষায়, অপরটি ধলভূমের লোকভাষায় নিয়ে তুলে ধরা হল—

রসু পুসু হাসু তাজিং
চিয়াম মেনেয়া
জিলু ইরেঞ কাঞা মাড়ি ইরেঞ কাঞা
বেঙ্গাড় জাগুরে দো মাড়িঞ জমেয়া।

[কি বলব, আমাকে অস্বস্তি লাগছে, জরজর মনে হচ্ছে। (তাই) মাংসও খাব না, ভাতও খাব না। একটা ছোট্ট বেগুন পোড়া জুটলে (দুটি) ভাত খেতাম।]

বলা বাহুল্য যে, জরটর সব মিছে কথা, গৃহস্থের বাড়ি থেকে দুচারটে বেগুন

১। স্মরণীয় যে, অনিচ্ছাকৃত গো হত্যাজনিত পাপস্খালনের জন্যও গলায় গোরুর দড়ি ঝুলিয়ে ঘরে ঘরে ভিক্ষে করার রীতি বর্তমান।

২। অর্থাৎ—'বাঁদর-নাচের গান'।

তুলে নেওয়াই এর মূল উদ্দেশ্য। বেগুনপোড়া এখানের অত্যন্ত প্রিয় ব্যঞ্জন। এরা পেশাদারী ভিক্ষুক নয়, কাজেই গৃহস্থ এদের বিমুখ করে না।

লোকভাষায় রচিত গানটিতে ভাব নয়, তালই মুখ্য। বাঁদর নাচের তালটি এই গানের বোলে নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে প্রতিধ্বনিত।

বুঢ়া যদি থাইকত খাইটের খুরা ছাঁইছত
ও বুঢ়ীর মা, আর বুঢ়া বাঁচবেক নাই গ
ও বুঢ়ীর মা, থাকতু না তুর থুরা বুঢ়া বাইগন কাঠের খুরা।

বেগুন কাঠের খুরা হয় না এ কথাটা যেমন সত্য, এদিন বেগুন ছাড়া যে ভাত রোচে না এটাও তেমনি সত্য কথা।

মকরের একটি প্রিয় অনুষ্ঠান 'ফুল বসা' বা ফুল পাতানো। সমবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে 'ফুল' বা বন্ধুত্বের সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত হয় মকরদিনে বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে ফুল বসে, মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে।[১] আশ্চর্য নিষ্ঠা ও সংযমের সঙ্গে এরা এই সম্পর্কটির পবিত্রতা রক্ষা করে সমস্ত জীবন ধরে ঐকান্তিক অনুরাগ ও আন্তরিকতার সঙ্গে। নদীর ঘাটে নববস্ত্র ও ফুলের মালা বদল করে এই সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত হয় পবিত্র মকর দিনে। ফুলের বাবাকে এরা 'ফুল বাপ' বলে সম্বোধন করে, মাকে বলে 'ফুল মা' এবং উৎসবে বিপদে এরা ফুলের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, দায়দায়িত্বের ভাগ নেয়, তার দুঃখে কাঁদে, সুখে হাসে। টুসুগীতে এই ফুলের প্রসঙ্গ বারংবার শ্রুত—

অ[২] মা আমি ফুল পাতাব
ফুলকে আমি কি দিব
বাজার যাব পয়সা পাব
ফুলকে ফুলাম[৩] তেল দিব।

মকর সঙ্গীতের উৎসব, এই অঞ্চলের মানুষের প্রাণের আনন্দ বেদনা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ আসর। এখানের প্রত্যেকটি উৎসব-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সঙ্গীতের শতদল প্রস্ফুটিত। মকর এখানের শ্রেষ্ঠ উৎসব। তাই এই উৎসবকে

১। সাধারণতঃ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই ফুল বসে। তবে বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সম্পর্ক স্থাপনে কোনো বাধা নেই। কচিৎ তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এই বিশেষ সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপূর্ব রোম্যান্টিকতার সৃষ্টি করে।

২। =ও।

৩। =ফুলের সুবাসযুক্ত (বাস তেল নামেও পরিচিত)।

কেন্দ্র করে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে সংখ্যায় (quantity) ও স্বাদুতায় (quality) তা সর্বাতিশায়ী। আর এই সব সঙ্গীতের মধ্যমণি 'টুসু' যাকে লক্ষ্য বা উপলক্ষ্য করে সঙ্গীতের সহস্রধারা বিকশিত হয়েছে।

মকরগীত, বাঁদনাগীত, করমগীত ইত্যাদি সব গীতই লোকগীতি। কিন্তু প্রত্যেকটি গীতের লগ্ন যেমন পৃথক্ 'সুরও' তেমনি আলাদা। শুধু সুর টুকু শুনেই চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায় গীতটি মকরগীত না বাঁদনাগীত। প্রত্যেকটি সুরের একটি আশ্চর্য্য সম্মোহিনী শক্তি বর্তমান যা স্থান কাল পাত্রের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মানানসই। মকরদিনে বাঁদনাগীত বা বাঁদনায় মকরগীত শুধু যে গাইতে নেই তাই নয়, বাসরঘরে কালীকীর্তনের মতো অত্যন্ত বিসদৃশ ও বেমানান।

সব মকরগীত যে একই সুরে গাওয়া হয় তা নয়। আনুষ্ঠানিক গানগুলির সুর এবং রংয়ের গানের সুর সম্পূর্ণ পৃথক্। তাছাড়া আনুষ্ঠানিক গানগুলিও একাধিক সুরে গীত হয়। তবে সব সুরের মধ্যেই একটি সামান্য গুণ বর্তমান থাকে যাকে বলতে পারি মকর সুর। বিভিন্ন আকারের গোলাপ হলেও সবই যেমন গোলাপ, তেমনি মকরগীতে কিঞ্চিদধিক সুরের পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও সব গীতই মকরগীত যা বাঁদনাগীত, করমগীত, ঝুমুর ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই কারণে অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, মূলতঃ যেটি দাঁইড় নাচের গীত সেটিও মকরগীতের সুরে সমর্পিত হয়ে মকরগীত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। নব বর্ষার জলধারা পুষ্ট মৃত তৃণের দল যেমন সহস্র শাখায় সঞ্জীবিত হয়ে রুক্ষ মাঠের শুষ্কতাকে শ্যামলিমায় সুশোভিত করে, মকরের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এখানের মানুষের প্রাণের বীণাও বিচিত্র সুরে বেজে ওঠে। সঙ্গীত-মত্ততার সঙ্গে সঙ্গে আসর-মত্ততার মণিকাঞ্চন সংযোগে বাছবিচারের অবকাশ অল্পই থাকে। সঙ্গীতের জোয়ার নামার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার জল কখন যে যমুনায় এবং যমুনার জল গঙ্গায় চলে যায় তা বুঝি নদীগুলি নিজেরাও জানে না।

মকরের মধ্যমণি টুসু। এই টুসুর বোধন ও বিসর্জনেই এই উৎসবের প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি। ধলভূমে টুসুর মূর্তি নির্মিত হয়। সে মূর্তি ছোট্ট একটি বালিকার। পুরুলিয়ার (প্রাচীন মানভূম) টুসু বিমূর্ত, সেখানে কাগজের একটি ঘেরাটোপই টুসু। ধলভূমে এই বালিকা মূর্তিটিকে নানাবিধ কারুকার্যে সুশোভিত করা হয়। ইদানীং এখানে বৃহদাকার টুসুও নির্মিত হচ্ছে এবং টুসুকে পৌরাণিক দেবী (যথা লক্ষ্মী সরস্বতী ইত্যাদি)-দের আদলে আঁকার

প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু এগুলি আদিম সংস্কৃতিকে বিকৃত করার সচেতন বা অচেতন প্রয়াস ছাড়া অন্য কিছু নয় এবং এসব সত্ত্বেও ধলভূমের আদিম টুসু এখনো আপন মহিমায় ভাস্বর।

ধলভূমে টুসুর মূর্তি নির্মিত হয়, বালিকা-কিশোরীর দল টুসুর পূজা করে, কচিৎ প্রণামও করে কিন্তু টুসু দেবী নয়। তার পূজা স্নেহের পরিচর্যা মাত্র, ভয় বা ভক্তির অর্ঘ নিবেদন নয়। এখানে টুসু বালিকা-কিশোরীর প্রিয় সঙ্গী, মায়ের আদরের কন্যা। টুসুর এই মানবী রূপটিই সর্বদা এবং সর্বত্র পরিদৃশ্যমান। এই কারণেই টুসু গীতের আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতেও ভক্তির ভাব নয়, স্নেহ ও বাৎসল্য রসেরই একাধিপত্য। সঙ্গীতের শতদলে টুসুর বালিকা কিশোরী-তরুণী মূর্তিটি বিভিন্ন রূপে ও বিচিত্র ছন্দে তরঙ্গিত।

কখনো টুসু অবুঝ মেয়ে—খেতে চায় না কিছু। রাত্রে হাতে চাঁদ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মা তার কান্না থামানোর প্রয়াস করেন—

আমার টুসু খায় না কিছু
শুকাই গেল[১] চাঁদ বদন।
রাইত হইলে চাঁদ ধরি দিব
কাঁইদ না রে টুসু ধন।

বালিকা টুসু কুল গাছের নীচে ক্রীড়ারত। কেউ তার গায়ে ধুলো দিয়ে সোনার অঙ্গ মলিন করেছে দেখে মায়ের আক্ষেপ ও অভিযোগ—

একটি আমার সাধের টুসু
কুইলতলা বই খেলে না।
কন বিরালী ধুলা দিল
গায়ের বরণ ফিরে না।

কখনো টুসু শহরের মেয়ে—বিদ্যুতের আলোয় অভ্যস্ত। গ্রামের ডিবা-লণ্ঠনের আলো তার পছন্দ হয় না।

টুসুর পাশে[২] আল[৩] জলে
জলে গা কাল[৪] আল।

১। =শুকিয়ে গেল।
২। =কাছে
৩। =আলো
৪। =কালো

বিষ্টুপুইর্যা[১] টুসু তুমি
খুঁজ না ঝাড়ের আল।

টুসু পথে পথে খেলা করে, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়—অবিকল গাঁয়ে-ঘরের মেয়ের মতো।

বড় বনে লতা পাতা
ছট[২] বনে শাল বাতা।
কন[৩] বনে হারালে টুসু
সনার[৪] বাঁধা লাল ছাতা।
রং-লখন[৫] ধর ছাতা
কাল মেঘে জল পড়ে ঠপা[৬] ঠপা।

টুসু ফুল ভালবাসে। তার দু'হাতে দুটি পদ্ম এবং সেই পদ্মের গন্ধে মধুলোভী ভ্রমরের আনাগোনা।

আদাড়ে বাদাড়ে[৭] পদ্ম
পদ্ম বৈ আর ফুটে[৮] না।
টুসুর হাতে জড়া[৯] পদ্ম
ভমর বৈ আর বসে না।

টুসু দেবী নয়, মানবী; বালিকা-কিশোরীদের খেলার সাথী। বালিকারা তাকে সঙ্গে নিয়ে খেলতে যায়, নদীর বালিতে আল বেঁধে খেলা করে,

---

১। =বিষ্টুপুরের (ধলভূমের প্রসিদ্ধ শহর জামশেদপুরের অঞ্চল বিশেষ বিষ্টুপুর নামে পরিচিত)
২। =ছোট
৩। =কোন
৪। সোনার
৫। <লক্ষণ। রামায়ণের দেবর লক্ষণ কি সূত্রে টুসুর মাথায় ছাতা ধরার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছে তা আমাদের জানা নেই, তবে এটা জানি ও মানি যে, এ অঞ্চলের লোক-মানসে রামায়ণী সংস্কার সুদৃঢ় ও সুদূর প্রসারী।
৬। <ফোঁটা [বর্ণ বিপর্যয় ও মহাপ্রাণের স্থান পরিবর্তনটুকু লক্ষণীয়]
৭। বাদাড় শব্দের অর্থ বেড়া। আদাড়ে বাদাড়ে মানে চতুর্দিকে সর্বত্র।
৮। =ফোটে
৯। =যোড়া।

'বালিচুয়া (নদীর বালির বুকে নির্মিত ছোট গর্ত)র জলে স্নান করে 'ঝরকা' (জানালা)য় বসে চুল শুকোয়।

চল টুসু চল খেইলতে যাব
বালিতে আইড়[১] বাঁধাব
বালির জলে সিনান কইরে
ঝরকায় চুইল শুকাব।

টুসু অভিমান করে খায় না—ঘরেও আসে না। থালা ভরা জিলাবি নিয়ে গিয়ে তার মান ভাঙাতে হয়।

আমার টুসু মান কইরেছে
উ-কুল্হীর তমাল তলে।[২]
থালে সাজা ঝিল্পি[৩] খাজা
চল যাব মান ভাঙ্গাতে।

তম্বী টুসুর পথ চলাটুকুও সুন্দর। সে যখন পথ দিয়ে হাঁটে তখন তার তম্বী শরীরটি বিনা বাতাসেই হিল্লোলিত হয়।

এক সড়পে[৪] দু সড়পে
তিন সড়পে লক[৫] বলে।
আমার টুসু মইধ্যে চলে
বিন[৬] বাসাতে[৭] গা হিলে।

টুসু মাঝে মাঝে তীর্থ করতেও যায়। পথে যাতে তার কষ্ট না হয় তজ্জন্য মা তার গামছায় ঘিয়ের মিষ্টি[৮] বেঁধে দেন।

১। =আল।

২। অভিমানের স্থানটি চিরাচরিত তমালবন—রাধাকৃষ্ণ লীলার মান-অভিমানের সুমধুর স্মৃতিপুষ্ট এবং লোকমানসে বৃন্দাবনী সংস্কারের সুস্পষ্ট স্মারক।

৩। ঝিলাপি ও বলে (জিলাবি)

৪। =প্রশস্ত রাজপথ

৫। =লোক

৬। =বিনা (ব্যতীত)

৭। <বাতাস (বর্ণ বিপর্যয়)

৮। এখানে ডালডার মিষ্টিই ঘিয়ের মিষ্টি নামে পরিচিত। সাধারণতঃ বাদাম তেলের মিষ্টির সঙ্গেই এরা সর্বাধিক পরিচিত।

টুসু নকি[1] দক্ষিণ[2] যাবেক
খিদা লাইগলে খাবেক কি।
আন টুসু গায়ের গামছা
ঘিয়ের মিঠাই বাঁইধ্যে দি।

টুসুকে ধুলায় খেলা করতে মানা করা হয়। মা তার দরিদ্র রমণী, সাবান কেনার সামর্থ তাঁর নেই।

ধুলাতে খেল না টুসু
কাপড় মৈলা[3] হবেক গ।
মা যে তুমার অভাগিনী
সাবন কথা[4] পাবে গ।

টুসুর পরণের শাড়িটি অত্যন্ত মিহি—চল্লিশ হাত লম্বা কিন্তু গোটালে হাতের মুঠোতে ধরা যায়। বলাবাহুল্য চল্লিশ হাতের কাপড় হয় না। সে রকম কোনো কাপড় পরিধান করা দূরে থাক এখানের নিরন্ন লোকায়ত মানুষ তা চোখেও দেখেনি। কিন্তু যা বাস্তবে নেই তা স্বপ্নেও থাকবে না তাই বা কেমন কথা! তাই স্নেহের দুলালীর অঙ্গ সেই স্বপ্ন-সম্ভবা শাড়ি দিয়ে সাজিয়েছে এরা সাদরে ও সানন্দে। শাড়িটা মিথ্যা হতে পারে কিন্তু এদের স্বপ্ন ও সাধটুকু অবশ্যই সত্য।

আমার টুসু কাপড় পর্‌হে[5]
নামে খইড়কা কুঁচি গ
মেলিলে চল্লিশ হাত যা
গুইড়ালে[6] এক মুঠি গ।

১। না কি।

২। তীর্থ করতে এখানের লোকেরা পুরী যায়। পুরী যাওাকে দক্ষিণ যাওয়া বলে।

৩। =ময়লা

৪। কোথা (কোথায়)।

৫। =পরিধান করে

৬। =গোটালে

এখানের সব ঘরই মাটির ঘর। প্রত্যহ প্রভাতে সে ঘরে গোবরের 'ছঁচ'[১] দিতে হয়। টুসুও ঘরে ছঁচ দেয়।

উপর কঠা[২] উইঠলে টুসু
ভাল কইর‍্যে ছঁচ দিবে।
নাইম্‌বার বেলা[৩] মনে করি
শিবের মাথায় ফুল দিবে।

এখানের মানুষের অঙ্গে আভরণ থাক বা নাই থাক টুসুর অঙ্গে কিন্তু অলঙ্কারের অভাব নেই। সেই অলঙ্কার চুরি যাওয়াতে থানাদারকে কর্তব্য-চ্যুতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

ও রে ও রে গাঁয়ের থানাদার
কন কুল্‌হীতে রন[৪] দিলি।
আমার টুসুর গহনা চুরি
কার ঘরে ঘুমাইছিলি।

টুসু বেড়াতে ভালোবাসে। সে শুধু দক্ষিণে[৫] যায় না, পূর্ব-পশ্চিমেও যাতায়াত করে।

টুসুর পশ্চিম-যাত্রা রাঁচি পর্যন্ত।[৬] টুসুর মা-বাবা গরীব হলেও টুসু কিন্তু বড়লোক। রাঁচি সে একা যায় না, সঙ্গে চাকর যায় ছ জন। ফিরে আসার পথে সে টাটার কারখানাটিও দেখে আসে।

আমার টুসু রাঁচি যাবে
সঙ্গে চাকর ছ জনা।
কালীমাটী[৭] হই[৮] ফিরবে
দেইখবে টাটার কারখানা।

১। অঞ্চল বিশেষে 'লাতা দেওয়া'ও বলে।
২। =কোঠা (=ছাদ)
৩। =নেমে আসার সময়
৪। প্রহরার্থে পরিভ্রমণ
৫। পূর্বে দ্রষ্টব্য।
৬। এটাই ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম প্রান্তের শেষ সীমা।
৭। টাটানগর (জামসেদপুর) শহরের প্রাচীন নাম।
৮। =হয়ে [এখানের অধিকাংশ অসমাপিকাই ই-কারান্তক।]

টুসুর পূর্ব-যাত্রা কলকাতা পর্যন্ত। টুসু ট্রেনে চেপে কলকাতা যায়। ট্রেনের বর্ণনাটুকু ('উপর পাটা তলে পাটা') বাস্তব ও মনোরম। ট্রেনে টুসুর সঙ্গে দারোগাবাবুও যান। দারোগাবাবুকে অনুরোধ (? আদেশ) করা হয়েছে একটুখানি সরে বসে টুসুর জন্ম জায়গা করে দিতে। এখানে দারোগাবাবুরা প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং অত্যন্ত ভয় ও সম্ভ্রমের পাত্র। সাধারণ মানুষ তাঁদের সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, মুখোমুখি হতেও ভয় পায়। কিন্তু টুসুর জন্ম সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষটিকেও সরে বসতে বলা হয়েছে অত্যন্ত অবলীলায় এবং অকুতোভয়ে। টুসুর কলকাতা-দর্শনের ফলশ্রুতিটুকুও চমৎকার। এ বেনামীতে গাঁয়ের মানুষের চোখে নগর-দর্শনের ইতিকথা।

তলে পাটা উপরে পাটা
তায় বইসেছে দরগা[১]।
হে দরগা সইরাই বস
টুসু যাবেক কইলকাতা।
কইলকাতা যে গেছিলে টুসু
কি কি ঝুঁটি উইঠেছে।
মাথায় ফিরিঙ্গা[২] ঝুঁটি
পায়ে জড়া মল আছে।

টুসু শুধু কন্যারূপে নয়, অন্যান্য মানবিক সম্পর্কের সূত্রেও সাকার হয়ে শোভা পেয়েছে সঙ্গীতের শতদলে।

আমবাগানের ঘুঙ্গি মালা
মিশরিগঞ্জের হারমণি।
আমায় কিনে দে ন দাদা
সনার বাঁধা বিয়নী॥
ও ভমনী বুন বিয়নী
তর বিয়নীর কত দাম।
ঘরে নাইখে টুসুর দাদা
কে দিবেক বিয়নীর দাম॥

১। =দারোগা।
২। =ফিরিঙ্গী।

টুসু এখানে স্বামীর বোন অর্থাৎ ননদ এবং টুসুর এই মূর্তিটিও মধুর ও মানবিক (human)।

একটি গীতে টুসুকে মানা করা হয়েছে কচি কদম তুলতে। বলা হয়েছে—

কদম গাছে উঠ্‌ইলে টুসু
কঁচি কদম পাইড় না।
পাকলে কদম সবাই খাব
কাখও[1] মানা কইরব না।

বৃন্দাবন-সূত্রেই হোক অথবা যে-সূত্রেই হোক কদম্ব এখানে রোম্যান্টিকতার লক্ষণাক্রান্ত।[2] গীতটি রোম্যান্টিক ইশারা ও ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। এখানে টুসুকে উপলক্ষ করে আদিম মনের প্রণয়াকৃতিই পরিস্ফুট। স্মরণ রাখতে হবে যে, মকরগীত টুসুগীত নামে খ্যাত হলেও টুসুই এখানে একমাত্র প্রসঙ্গ নয়। জীবন ও জগতের নানা কথা, আদিম মানব-মানবীর অনুভব অনুভূতি অবলীলায় উৎসারিত হয়েছে টুসুকে কেন্দ্র করে।

টুসু ধলভূমের প্রাণের ধন। তাকে নানাভাবে সাজিয়েও এখানের মানুষের মন ভরে না। এ বছর যত সাধ ছিল তত সাধ্য ছিল না। তাই আগামী বছরে তাকে পর্যাপ্ত অলঙ্কারে বিভূষিত করার আগাম প্রতিশ্রুতি।

ই বছর যেমন তেমন
আইসছে বছর মেড়[3] দিব।
হাজার টাকার গহনা আইন্যে
টুসু ধনকে সাজাব।

হাজার টাকা অবশ্য এরা চোখে দেখেনি, তবে হাজার টাকা যে অনেক টাকা সে কথা এরা জানে।

টুসু-গীতে টুসুকে শুধু বালিকারূপে প্রত্যক্ষ করি না, তাকে তরুণীরূপেও পাই। মুকুলিত বালিকাবয়সী টুসু কখন যে অবলীলায় কটাক্ষচঞ্চলা তরুণী-রূপে আত্মপ্রকাশ করে তা আমরা বুঝতেও পারি না। সেই তরুণী টুসু কখনো সঙ্গীতরতা—

১। =কাউকে
২। দ্রষ্টব্য এই লেখকের 'সাহিত্য সম্পর্কিত'।
৩। =প্রতিমা

আমার টুসু গায়ন করে
তপুবনের[১] কানাচে।
কি কইরে মা শুইনতে যাব
জুড়িয়ার[২] বানে ঢেউ মারে।

কখনো বিরহিণী নায়িকা—কোকিল রবাঘাতে মূর্ছাহত—

বাড়ি নামহয় তমালের বন
ককিল[৩] ডাকে ঘনে ঘন।
আর ডাইক না পানের[৪] ককিল
টুসু ঘুমে অচেতন।

টুসুর প্রণয়োৎসুকা নায়িকারূপটিও কৌতুকের সঙ্গে লক্ষণীয়—

কুইলগাছে কুইলীর[৫] বাসা
ডালিম গাছে কেরকেটা।[৬]
আমার টুসু ফাঁদ আইড়েছে[৭]
পইড়েছে রাজার বেটা।

যে টুসু এত আদরের ধন, যে টুসু খড়কে পাড় কাপড় ছাড়া পরে না, মায়ের সদা সতর্ক স্নেহ-দৃষ্টিতে যে সর্বদা অভিসিঞ্চিত সে কি করে পরের ঘরে গিয়ে জীবন কাটাবে সে কথা ভেবে মায়ের প্রাণ কেঁদে ওঠে আশঙ্কায় ও আর্তনাদে। পরের ঘরে মায়ের স্নেহ তো সহজলভ্য নয়।

ও মা আমি রৈতে লারি[৮]
লারি গ পরের ঘরে।
পরের মা কি বেদন জানে
জ্বালা দেয় আমার পানে।[৯]

১। =তপোবনের
২। জুড়িয়া (দেশী শব্দ ; অর্থ ছোট নদী।
৩। =কোকিল
৪। =প্রাণের
৫। =কোকিল (স্ত্রী লিঙ্গে)
৬। একপ্রকার পাখী
৭। ফাঁদ আড়া=ফাঁদ পাতা
৮। =নারি (=পারি না)
৯। প্রাণে

ধলভূমের টুসু বাংলার গৌরী। গৌরীকে কেন্দ্র করে আগমনী-বিজয়ার যে সঙ্গীত আকুল করেছে বাংলার আকাশ ও বাতাসকে টুসুকে কেন্দ্র করে অনুরূপ আনন্দ বেদনার সহস্র সঙ্গীত সিক্ত করেছে শাল-পলাশ-মহুল-কুটুস-আসন-পড়াশি পরিপূর্ণ ধলভূমের মাটিকে।

টুসু পরবে এখানের বিবাহিতা মেয়েরা পিত্রালয়ে আগমন করে, পরব শেষ হলেই তাদের স্বামীগৃহে ফিরে যেতে হয়। এদিক দিয়ে বিজয়াদশমীর সঙ্গে মকরের কোনো পার্থক্য নেই। নবমীর রাত্রি এবং বাঁউড়ির রাত—উভয়েরই ভোর হয় মিলন-সুখ-মুগ্ধা মাতৃক্রোড় থেকে কোলের মেয়েকে ছিনিয়ে নেবার জন্যেই।

সাংবাৎসরিক এই মহোৎসবে যে মেয়ে পিত্রালয়ের সুখদর্শনে বঞ্চিত তাদের মর্মভাঙা যন্ত্রণার দীর্ঘশ্বাসে দগ্ধ হয়ে কয়েকটি টুসুগান সাহিত্যের অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে।

গিরিরাজ নন্দিনীর সঙ্গে ধলভূমের প্রাণনন্দিনী টুসু কখনোকখনো আক্ষরিক অর্থেই একাত্ম হয়ে পড়েছে। সীমান্ত অঞ্চলের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের এই রাখী-বন্ধন নিঃসন্দেহে মধুর।

টুসুর পিত্রালয়ে থাকার দিন শেষ হয়ে আসছে, নিঃশেষ হয়ে আসছে সাংবাৎসরিক আনন্দঘন মধুর মুহূর্তগুলির পরমায়ু। এবার মা-বাবা তাকে বিদায় দেবেন। কিন্তু তার বাঁক এবং হাঁসুলী ভেঙে গিয়েছে। মা-বাবা সেগুলি এখনো গড়িয়ে দেন নি। তাই টুসুর আক্ষেপ—

বাঁক ভাঙা হাঁসুলী ভাঙা
আর কবে গড়াই দিবি।
আর ত মাসে দিন নাই মা
কৈলাসে বিদাই দিবি।

পিত্রালয়ে টুসুর মেয়াদ তিরিশ দিন, গৌরীর বরাদ্দ মাত্র তিন দিন। গানের তৃতীয় পংক্তিতে ("আর ত মাসে দিন নাই মা") টুসু সাকার, চতুর্থ পংক্তিতে ('কৈলাসে বিদাই দিবি") গৌরী সরব। সব মিলিয়ে গানটি আরণ্যভূমির গৌরী টুসুর অভিমানাহত নয়নের অশ্রুজলে সিক্ত।

আসলে বাংলাদেশ যেমন হিমালয়নন্দিনী গৌরীর মধ্যে নিজ গৃহনন্দিনীদের মুখচ্ছবি প্রত্যক্ষ করেছে—তাঁর আগমনী-বিজয়াকে কেন্দ্র করে মাতৃহৃদয়ের আনন্দ-বেদনা সহস্রধারায় উচ্ছ্বসিত ও উদ্বেলিত হয়েছে, টুসুর মধ্যে ধলভূম-

বাসীরাও নিজ নিজ প্রিয়তমা কন্যার মুখচ্ছবি প্রত্যক্ষ করেছে। টুসু-গীতের একটা বড়ো অংশকে টুসুর আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত বলে উল্লেখ করা যায় যেখানে টুসুকে কাছে পাওয়ার আনন্দ ও বিদায় দেওয়ার দুঃখ উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

টুসু মায়ের একমাত্র মেয়ে, আদরের ধন, নয়নের মণি। মা তাকে শ্বশুর-বাড়ি পাঠাবেন না।

একটি আমার সাধের টুসু
না পাঠাব শ্বশুর ঘর।
মইধ[১] ঘরে হিঁদোলা দিব
খেলাইতে দিব পাড়ার লক[২]।

তবু টুসুকে শ্বশুরবাড়ি যেতেই হয়। মা-বাবাকেও চোখের জল চেপে রেখে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর আয়োজন করে দিতেই হয়।

আয় রে ময়রা ধর রে ঝাঁঝরা
দে রে চিনির পাগ[৩] করে।
টুসু যাবে শ্বশুরবাড়ি
দে রে ময়রা সাইৎ[৪] করে।

টুসুর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা আছে একটি গীতে—

জল জল যে কর টুসু
জলে তুমার কে আছে
মনেতে ভাবিএ দেখ
জলে শ্বশুর ঘর আছে।

টুসু চলে যায়। রেখে যায় মায়ের দু'নয়নে অশ্রুজল, বুকে আগামী বছর এমনি দিনে ফিরে পাওয়ার দুর্মর বাসনা।

তুমি টুসু জলে যাচ
কবে দেখা পাব গ।
জলে গেলে কারে মা গ

১। =মধ্য
২। =লোক
৩। =পাক
৪। =আয়োজন

মা বইলে ডাকিবে গ।
জলে যাছ ভাল কথা
সুখে চলি যায়ো গ
আইসছে বছর এমন দিনে
আরই[১] যেন আস[২] গ।

লোকায়ত জীবনে স্বামীগৃহ অপেক্ষা পিতৃগৃহের শ্রেষ্ঠত্ব সোচ্চারে স্বীকৃত। স্বামীগৃহে নারীর বিড়ম্বিত জীবনের দুঃখ দুর্দশার ইতিহাস এখানে অদ্যাপি অব্যাহত। 'বালিকাবধূ'র ক্রন্দনে এই অরণ্যভূমির আকাশ-বাতাস অশ্রুময়ে সিক্ত। টুসু বালিকার সহচরী, বালিকা রূপেই তার বোধন ও বরণ। তাই বুঝি টুসুগীতের একটা বড়ো অংশ গড়ে উঠেছে এই বিড়ম্বিত বধূজীবনের ইতিবৃত্তকে অবলম্বন করে। টুসুগীতের এই অংশটি অরণ্যভূমির সমাজজীবনের জীবন্ত দলিল। নিম্নোক্ত গীতটিতে পিত্রালয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সানন্দ স্বীকৃতি, সেইসঙ্গে স্বামীগৃহের স্নেহহীন দিনলিপির দুঃসহ দুঃখকথা যুগপৎ অভিব্যক্ত।

বাপের ঘরে বড় সুখ মা
কাঁথে গইর‍্যা[৩] চালভাজা।
সসুর ঘরের বড় দুখ মা
লক[৪] বুঝাইতে যায় বেলা॥

প্রতিপ্রসঙ্গে পতিগৃহের তুলনায় পিতৃগৃহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের একটা দুর্মর প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয় এখানের লোকগীতে।

বাপের ঘরে নাড়িচাড়ি
শুধুই গ পাটের শাড়ি।
সসুর ঘরে নাড়িচাড়ি
শুধুই গ ভাঙা হাঁড়ি।

যেখানে পিতৃগৃহের তুলনায় পতিগৃহের অবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছল সেখানেও পতিগৃহের প্রতি বিকর্ষণের পরিমাণ বিন্দুমাত্র কমে না, বরং বাড়ে।

১। =আবার
২। =এসো
৩। কাঁসার জলপাত্র (গাগরী, গাগরা)।
৪। =লোক।

শুন গ পিসী শুন গ মাসী
সম্বুর ঘরের গঞ্জনা।
আমরা মা গরীবের ছেইলা[১]
ধনের দেয় গ তুলনা।

পোষ পরবে পিত্রালয়ে থাকার আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষা যে কত বেশী নিম্নোক্ত গীতটিতে তার পরিচয় আছে। গুণের দেবরের অভিমানসিক্ত নয়নের অশ্রুজলও পিত্রালয়গামিনী বধূর পথকে পিচ্ছিল করতে পারেনি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই অঞ্চলের বহু-লোকগীতে দেবরের প্রতি ভ্রাতৃবধূদের দুর্বলতার পরিচয় ও প্রমাণ প্রকট। এ কথাও সত্য যে, কোনো কোনো সমাজে বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বধূরূপে গ্রহণের রীতিও বর্তমান। কিন্তু তাই বলে একথা কিছুতেই বলা চলে না যে, আঞ্চলিক এই লোকায়ত জীবনে বৌদি-দেবরের দেহমিলনের অবাধ ছাড়পত্র সহজলভ্য বা সমাজ-স্বীকৃত। ভারতবর্ষের একাধিক জাতির মধ্যেই অনুরূপ প্রথার প্রচলন আছে। প্রতিবেশী রাজ্যেও অনুরূপ প্রথার প্রচলন আছে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসে সে সম্পর্কে রঙ্গরসিকতাও যথেষ্টই আছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে দেবর-ভ্রাতৃবধূর রোম্যান্টিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে রচিত কাব্যপংক্তির সংখ্যাও কম নয়।

পাটী পাইড়লম মাথা বাঁধলম
বাপের ঘর যাবার লাইগ্যে[২]
গুণের দেওর কাঁইদত্যে বইসল
করবরী[৩] ডাল ধইর‍্যে।
ডাল ধর আর যাই ধর ভাই
যাবই আমি বাপের ঘর·
পোষ রহিব মাঘ রহিব
তবে আইসব সম্বুর ঘর।

পোষ পরবের মধুর মুহূর্তগুলিকে আকণ্ঠ পান করার জন্য বাল্য-কৈশোরের

১। ছেলে (এখানে 'মেয়ে')।
২। =জন্যে
৩। =করবী

পরিচিত পটভূমিকাটির প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত। এ সময় পিতৃগৃহ ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

পায়ে আলতা কুল্‌হি কাদা
তাই আইসেছে[১] লিতে[২] গ
এত বড় পোষ পরবে
মন সরে না যাইতে গ।

আসলে স্বচ্ছলতা নয়, স্বাধীনতার প্রতি এদের আকর্ষণ অত্যধিক। মুক্ত জীবন এবং বদ্ধ জীবনের মধ্যে যে পার্থক্য, পিতৃগৃহের সঙ্গে পতিগৃহেরও সেই পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'বধূ' কবিতাটি এই পটভূমিকাতেই পাঠ্য। পিত্রালয়ে অভাব-অনটন আত্যন্তিক হলেও কন্যার নিকট তার আকর্ষণ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না।

টাঁইড়ে[৩] টাঁইড়ে গবর[৪] কুড়া
সে বরঞ্চ ভাল গ[৫]।
সসুর ঘরের কাজ নাই মা
সনার[৬] অঙ্গ কাল গ।

অরণ্য লোকের বধূর নিকট নারীর অধিকাররূপ বস্তুটি এখনো অজ্ঞাত। শ্বশুরালয়ে অল্পবয়সী বালিকাবধূর কর্ণদেশে এবং পৃষ্ঠদেশে অনেক নির্যাতনই সহ্য করতে হয় নীরবে। সেই নীরব কান্না নিঃশব্দে আত্মগোপন করে থাকে পিত্রালয়ের আঙিনায় অভিমানে আছড়ে পড়ার জন্য। পিত্রালয় প্রত্যাগত বধূ আপনজনের কাছে নিভৃতে প্রকাশ করে শ্বশুরালয়ের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার কথা।

চল গ পিসী চল গ মাসী
বল যাব ধান লিড়াইত্যে।
সসুর ঘরের গুণের কথা
বলইব গ আইড়ে[৭] বইসে।

১। =এসেছে
২। =নিতে
৩। =মাঠ
৪। =গোবর
৫। =গো
৬। =সোনার
৭। =(জমির) আল

কিন্তু তবু মেয়েকে শ্বশুরঘরে যেতেই হয়। বালিকা কন্যাকে শ্বশুরঘরে পাঠাতে গিয়ে মা বাবা-র বুক ফেটে যায়।

বাপে বলে বিদাই[১] বিদাই
মাঞেরর[২] ছাতি যায় ফাইট্যে।
ভায়ে বলে শিশু বহিন[৩]
পাছে রাস্তায় যায় কাঁইন্দে।

টুসুর বেনামীতে বালিকাও কাঁদে। তখন মা-বাবাকে চোখের জল মুছে স্নেহের দুলালীকে সান্ত্বনা ও সাহস দিতে হয়।

কাঁইদছ কেনে সাধের টুসু
বড় দাদার খুঁট ধইর‍্যে।
ই[৪] সংসারে বিটি ছ্যেইলা[৫]
কে আছে বাপের ঘরে!

শ্বশুর ঘর থেকে যে নিতে এসেছে তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে বলা হয় তাঁরা যেন মেয়েটির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

টুসু লেইগছ ভাল কইরছ
টুসু রাইখবে যতনে।
আমার টুসু শিশু ছেইল্যা
সসুরঘরের কি জানে!

মেয়ের সতীন সম্পর্কে এখানের মেয়েরা সর্বদাই আতঙ্কিত। সতীন এখানের বধূ জীবনের সব চেয়ে বড়ো অভিশাপ। যাবার বেলায় তাই মেয়েকে সাবধান করে দিয়ে বলা হয়—

যাছ যাছ যাছ টুসু
আগুপেছু ভাইল না[৭]।

১। =বিদায়
২। =মায়ের
৩। =<ভগিনী
৪। =এ
৫। =মেয়েছেলে
৬। =নিয়ে যাচ্ছ
৭। =তাকিয়ো না

দুপাশাড়ী[1] সতীন আছে
পান দিলে পান খায়ো না।

স্মরণীয় যে, এখনো এই অঞ্চলের বহু মেয়েকে সতীন নিয়ে ঘর করতে হয়। কাজেই সতীন ভীতি এদের প্রবল, এবং সতীনের প্রতি রাগও প্রচণ্ড। টুসু গীতেও সতীন-প্রসঙ্গ বারংবার শ্রুত। সর্বত্রই সতীনের প্রতি তীব্র বিরাগ উগ্রস্ত উমার প্রকাশটুকু সকৌতুকে লক্ষণীয়।

(ক) আয় লো সতীন বস লো সতীন
খাল সতীনের পাখাল ভাত
অদা[2] ঘরে শুয়াঁই রাখি
ধরাই দিব সন্নিপাত।[3]

(খ) এক শ টাকার ছলা ভাজা
সড়প ধারে ছইড়াব
সতীন মাগীর দেখা পালে[4]
গড়রাঁই[5] বুক ফাটাব।

মেয়ের জন্য মায়ের চিন্তা যতখানি মায়ের জন্য মেয়ের চিন্তা ততখানি। মায়ের চোখের জল মেয়ের চলার পথকে আরো পিচ্ছিল করে দেয়। মেয়ে যাবার বেলায় তার সঙ্গীসাথীদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে যায়—

সব সঙ্গতী পরাণগতি
দেইখ[6] আমার মা রহিল
যখন আমার মা কাঁদিবে
সবাই মিলে বদ[7] দিবে।

মায়ের খুব ইচ্ছে যে টুসু 'বেটার মা'[8] হবে। কিন্তু মায়ের সে স্বপ্ন সার্থক

১। =দু'পাশে
২। <আর্দ্র
৩। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে খুল্লনার প্রতি লহনার ব্যবহারটুকু স্মরণীয়।
৪। =পেলে
৫। =লাথি মেরে
৬। =দেখো
৭। <প্রবোধ
৮। =পুত্র সন্তানের জননী

হয় না—টুসুর কোলে ছেলে আসে না। তাই নিয়ে মায়ের আক্ষেপের অন্ত নেই।

চালভাজা কড়কইড়্যা[1] ভাজা
দিব টুসুর আঁচলে।
বইলেছিল বেটা[2] হবে
নাই মা টুসুর কপালে।

স্মরণীয় যে, লোকায়ত সমাজেও 'ভাইটি অমূল্য নাই তার তুল্য/সংসারে বোনটি নেহাৎ অতিরিক্ত।' সংসার জীবনে মেয়েদের যে মূল্যই থাক না কেন, মেয়েদের জীবন মূল্যহীন। তাদের জন্ম হয় কাঁদতে ও কাঁদাতে। টুসুগীতে বলা হয়েছে—

বারে বারে বারণ করি
পিঢ়ায়[3] আগুন জ্বাইল না।
বিটিছানা[4]র মিছাই[5] জনম
কাঁদায়ে পাঠায় না।

কাজেই মায়ের খুব আশা যে, টুসুর যেন মেয়ে না হয়, ছেলেই হয়। তাহলে টুসুকে অন্ততঃ তাঁর মতো কন্যা-বিদায়ের বেদনা ভোগ করতে হবে না।

কি কর কি কর টুসু
দুগ্‌গা[6] মেলায় বইসে গ
দুগ্‌গা মাকে শেওরণ[7] কর
হবে বেটা ছানা গ
বেটা ছানা হলে টুসু
দিব সনার ছাতা গ।

১। =যা কড় কড় করে চিবিয়ে খেতে হয়; যেমন, ছোলা-মটর ইত্যাদি।
২। =পুত্রসন্তান
৩। ঝিঁড়িতে
৪। =মেয়েছেলে
৫। <মিথ্যা+ই (নিশ্চয়ার্থক) (অকারণে)
৬। <দুর্গা
৭। <স্মরণ

বিটিছানা হলে টুসু
কাঁদাই[1] পাঠাব গ।

মায়ের আশঙ্কা টুসুর ছেলে হবে না, কারণ সে পরের ছেলেকে ভালোবাসে না। যে ছেলেকে ভালোবাসে না ভগবান তার কোলে ছেলে দেন না—দুর্মর এই লোকবিশ্বাসের দুর্গে ফাটল ধরে নি আজও।

ছেইলা ছেইলা কর টুসু
তুমার ছেইলা হবে না।
পরের ছেইলা ধইরে মার
ছেইলার বেদন জান না।

তবে লোকায়ত সংবাদ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা টুসুর যে ছেলে নেই বা তার ছেলে হতে পারে না একথা বলার লোক যেমন আছে, টুসুর যে ছেলে আছে সে কথা বলার মতোও লোকের অভাব নেই। সন্তানবতী টুসুকে সন্তানহীনা রূপে সম্বোধন করা বিদ্বেষদুষ্ট লোকাপবাদ কি না কে জানে!

টুসুর ছেলের গায়ে ধুলো দিয়েছে যারা তাদের প্রতি দুর্বিষহ বাক্যবাণ বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত গীতটিতে।

আমার টুসুর একটি ছেইলা[2]
কুইলতলা বই খেলে না
কন রাঁড়ীরা ধুলা দিল
ধুলার চিন্হা[3] গেল না।

যে টুসুর মানবাজারে শ্বশুরবাড়ি এবং যে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পিতৃগৃহে পালিয়ে এসেছে তারও একটি ছেলে আছে টুসুগীতে তার উল্লেখ আছে, তবে পালিয়ে আসার সময় টুসু ছেলেটিকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছে কি না সে কথার কোনো উল্লেখ নেই। সম্ভবতঃ সঙ্গে নিয়ে আসে নি। লৌকায়ত সীমন্তিনীরা স্বাধীন জীবনের আকর্ষণে প্রয়োজন হলে শুধু যে স্বামীকে ত্যাগ করে তাই নয়, সন্তানকেও পরিত্যাগ করে।

আমার টুসুর একটি ছাইলা[4]
মানবাজারে শ্বশুর ঘর

১। =কাঁদিয়ে
২। =ছেলে
৩। চিহ্ন
৪। =ছেলে

পালখার উপর কলসী রাখ্যে[১]
পালাই আইল বাপের ঘর।
পলাই আইল ভাল কইরল
আর ত ছাইড়ে[২] দিব না।
কমর বাঁধ্যে ঝগড়া লাগব[৩]
জামাই বইলে মাইন্‌ব না।

টুসু যে দেবী নয় তার আর একটি বড় প্রমাণ অপরের টুসুর প্রতি নিক্ষিপ্ত বিদ্রূপ ও কটূক্তিগুলি। টুসু দেবী হলে এটা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। সকলেই অপরের ছেলেমেয়ের তুলনায় নিজের ছেলেমেয়েদের বেশী সুন্দর দেখে। টুসুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

তরা যতই সখ দেখা
তদের টুসুর চইখ দুটি পিঁয়াজ ভাজা।

নিজের টুসু গুণবতী, সে নিজের হাতে মুড়ি ভাজে, অপরের টুসুটি পেটুক ও লোভী, সে হাত পেতে সেই মুড়ি ভিক্ষে করে।

আমার টুসু মুড়ি ভাজে
দলান কঠার উপরে।
উয়ার টুসু ছঁছরা[৪] মাগী
আঁচল পাতি লেয় মাইগ্যে।

নিজের ছেলেটি পদ্মলোচন, অপরের ছেলে কানা। স্বাভাবিকভাবেই জলে ভাসমান তিনটি টুসুর মধ্যে মাঝেরটি নিজের বলেই ছলনাময়ী ('ছলকদারী') ও অপরূপ শ্রীমণ্ডিতা এবং তার নয়নকোণে অনুরাগের আরক্তিম ইশারা।

তিনটি টুসু জলে যায় মা
কন টুসুটি ভাল গ।
মধ্যের টুসু ছলকদারী
জলে আঁখি ঠারে গ।

১। =রেখে
২। =ছেড়ে
৩। ঝগড়া লাগা—ধলভূমের বিশিষ্ট ইডিয়ম (=ঝগড়া করা)
৪। =পেটুক ও লোভী (পরের দ্বারে হাত পাতাই যায় স্বভাব)

শুধু তাই নয়, অপরের টুসুর মৃত্যু কামনা করতেও এদের বাধে না।

চাল ভিজাব রসে রসে
মুড়ি[১] ভাইজব রগড়ে।[২]
উয়ার টুসু মরি গেলে[৩]
কাঠ চালাব সগড়ে।[৪]

টুসু গীতে টুসু-কথার পাশাপাশি জীবন ও সমাজের নানা কথা নানাভাবে উচ্চকিত। এই জীবন ও সমাজ, বলাই বাহুল্য, সম্পূর্ণ লোকায়ত এবং একান্তই আদিম। এই আদিম ও লোকায়ত সমাজের রীতিনীতি, ধ্যানধারণা, কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র চিত্র ও চরিত্র এই গীতগুলি।

এখানের মেয়েরা শুধু নিজেদের পুত্র-সন্তান কামনা করে না, ভাই-দাদারও পুত্র সন্তান কামনা করে। পিত্রালয়ের বংশ যেন লোপ না পায়, এক ঘটি জলের আশা (এদের ভাষায় 'আশ্') যেন চিরদিন থাকে। সেই সাধের সুরে সাধা টুসুগীতের এই গানগুলি পরগৃহ নির্বাসিত বোনদের আকাঙ্ক্ষায় আপ্লুত ও অনুরাগে আরক্তিম।

(ক) ই বছর ত যেমন তেমন
আর বছরকে ডাক দিব।
বড় ভাইয়ের বেটা হলে
ঘর ভাইঙ্গে[৫] দালান দিব।

(খ) ই-ঘর কাদা উ-ঘর কাদা
বসাব লহার[৬] পাটা।
পাটায় বসি পান চিবাব
খেলাব ভাইয়ের বেটা।

১। =মুড়ি (ধলভূমের খাদ্যতালিকায় যার স্থান ও গুরুত্ব ভাতের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়)।
২। আনন্দের সঙ্গে (দ্রুত লয়ে)
৩। =মারা গেলে
৪। =মনুষ্যবাহিত কাষ্ঠনির্মিত ছোট গাড়ি।
৫। =ভেঙ্গে
৬। =লোহার

অবশ্য মা-বাপের ঘর আর ভাই-ভাজের ঘর যে এক নয় সে কথা এরাও স্বীকার করে।

আমরা মায়ের তিনটি বিটি
তিনটি সনার মাদুলী।
মা বাপের দুলালী আমরা
ভাই-ভাজের চইখের বালি।

একাধিক টুসুগীতে এই অঞ্চলের নিম্নবিত্ত মানুষের দারিদ্র্য-বিড়ম্বিত জীবনের ছবি নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত।

নামহ পাড়া গেছিলে টুসু
কার বা কত ধন আছে
কি বলইব ধনের কথা
ভাচা কুটি দিন যাছে।

'ভাচা-কুটা' এই অঞ্চলের দরিদ্র রমণীদের একটি প্রধান পেশা। চাষীর বাড়ি থেকে ধান নিয়ে গিয়ে সেই ধান সিদ্ধ করে, শুকিয়ে, ঢেঁকির গড়ে ফেলে চাল করে এরা নিয়ে আসে। বিনিময়ে চাষীর কাছ থেকে কিছু চাল পায়। অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য এই কাজ, পারিশ্রমিক ও পরিশ্রমের তুলনায় নগণ্য; কিন্তু যাদের কোনো কাজই জোটে না তারা ভাচা-কুটেই[১] পেট চালাতে বাধ্য হয়।

কয়েকটি গীতে এই অঞ্চলের প্রিয় ও পরিচিত 'বেসাতি'[২]র বিবরণ পাই। বলাবাহুল্য এগুলি দরিদ্র মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা।

(ক) অ টুসুর মা অ টুসুর মা
তাদের কি গ বেসাতি,
বাড়ির বাইগন ধাদ্‌রা শুকা[৩]
বড় বাঁধের গুগলি[৪]।

১। স্মরণীয় ধলভূমের প্রবাদ 'ভাচা ধানের মরাই' (=পরের ধনে ধনী সাজার অভিনয়)।
২। =তরকারী
৩। =শুকনো মাছ
৪। =শামুক

(খ) টুসুর মা গ টুসুর মা গ
আজ তদের কি বেসাতি
উপর গাড়িহার[১] ইটলা পুঁটি
নামুহ বাড়ির বিলাতি।

পান অবশ্য খাদ্য নয়, কিন্তু ধলভূমের মানুষের পেটে না হোক, প্রেমে পানের একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে।

পান এখানে প্রণয়ের নিত্যসঙ্গী। তরুণের হাত থেকে তরুণীর পানগ্রহণ প্রণয়-স্বীকৃতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান। পান এখানে শুধু অধরকে নয়, অন্তরকেও রঙ্গে-রসে উচ্ছল ও উন্মুখ করে তোলে। বেশ কিছু রঙের গান পানের রক্তরাগে রঙিন।

(ক) পান দিলে পান খাব না
ভালবাসার আশা কইরব না।

(খ) পানখিলিটা ছাগলে খাইল
আমার তখেই[২] দিবার মন ছিল।

(গ) জয়দা[৩] দহয় কই দেখা দিলি
আমি পান কিনে ভাইল্যে[৪] বুলি[৫]।

(ঘ) তখে পান দিলটা কে বঠে
ভাইয়ের শালা সাঙ্গাতেই বঠে।

(ঙ) অ পান খাবে যদি
মনে কইর্যো আনবে হে সনার জাঁতি।

(চ) কি দিলি রে পান পাতে
মন করে নাই ঘর ঘুরি যাতে।

মন্ত্রপূত বা দ্রব্যযুক্ত পানের মাধ্যমে বাঞ্ছিত পুরুষ বা রমণীকে যে বশীকরণ সম্ভব সে কথা এখানের লোকসংস্কার সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে।

১। গড়িয়া = ছোট পুকুর

২। = তোকেই

৩। চাণ্ডিল থানার অন্তর্গত সুবর্ণরেখা নদীতীরস্থ একটি স্থান। এখানের মকর মেলা বিখ্যাত।

৪। = তাকিয়ে

৫। = বেড়াই, ভ্রমণ করি।

টুসুগীতের আনুষ্ঠানিক গানগুলি সাধারণতঃ চার পংক্তির। লক্ষণীয় যে, এই আনুষ্ঠানিক গীতগুলির মধ্যে ঔপচারিক ('Ritual) গীতের সংখ্যা নগণ্য। মাত্র কয়েকটি গীতেই টুসু-পূজার অর্ঘ-উপচারের উল্লেখ আছে, বাকি সব গানেই মানবী টুসুর মধুর ও মনোহর বর্ণনা। এই আনুষ্ঠানিক গীতগুলির মধ্যে এমন কিছু গীতও আছে যেগুলি সুরে-ছন্দে আনুষ্ঠানিক গীতি হলেও রসে ও স্বভাবে সম্পূর্ণরূপে আনন্দগীতি। এগুলিকে আনুষ্ঠানিক ছন্দে রচিত রংয়ের গান বললে অত্যুক্তি করা হয় না। এই গীতগুলিতে টুসুর কথা নেই, আছে যৌবনের কথা ও ব্যথা। যৌবন-বেদনারসে উচ্ছ্বসিত, মিলনাকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ, বিরহ-বেদনায় উন্মন এই গীতগুলি আকারে টুসুগীত হলেও আসলে যৌবনগীতি।

(ক) অ রে অ রে কালছঁড়া[১]
পানে কেনে চুন দিলি
অত দিনের ভালবাসা
আজ কেনে জবাব দিলি।

(খ) একটি ডগে দুটি পাইরা[২]
জড় ভাঙি বিজড় হইল
আমার বঁধু নিঠুর হইল
দেশ ছাড়ি বিদেশ গেল।

(গ) অ ভায়ের[৩] শালা
আজ থাকি যা আমার ঘরে এক বেলা।
মদের থালা ধরব হে
পর্‌হাব মনে মালা।

(ঘ) ভালবাসা বইলে ছিল
আসব মাসের তিন দিনে
দিনে দিনে মাস ফুরাইল
আইল না বছর দিনে।

১। এখানে তরুণ মাত্রেই 'ছঁড়া', তরুণী—'ছঁড়ি'।
২। =পায়রা
৩। =ভাইয়ের

(ঙ) আঁধার ঘরে কাল ভমর
বিঁধি করইল জরজর
আর বিঁধ না কাল ভমর
তুমার বই লই[১] কার।

(চ) মনের কথা মনে রহিলা[২]
স্বামী রহিলা বিদেশে
নামালিয়া[৩] ধান কাটি
আসিবে কি এ মাসে।
যা রে পাখি যা রে উড়ি
বাগনানে কি হাউরে
টাকা পইসা[৪] কি হবে মর[৫]
দেখমু তাকে এ ঘরে।

(ছ) কার ঘরে মাঁড় কুঁড়া খাসি মারে গঁড়াগঁড়া[৬]
এ হেন পরব নাহি দেশে
দেশে যত কানাকুজা[৭] সবাই হৈয়ে যায় সাজা[৮]
আমি বসি নামালিয়ার আশে।
দিদি ল ঘরে আর মন নাই বসে।

(জ) অ ল অ ল শিশুছঁড়ি
তর কথার কি সং[৯] আছে

১। =নই।
২। এই গানটি (এবং পরেরটি) বহড়াগোড়া অঞ্চলের ; উড়িয়ার প্রভাব।
৩। এখানের দরিদ্র মানুষেরা কাজের সন্ধানে পশ্চিমের নিম্নাঞ্চলে যায়, আঞ্চলিক ভাষায় যা 'নামাল' বা 'নাম্হাল' খাটা নামে পরিচিত।
৪। =পয়সা
৫। =মোর
৬। <গণ্ডা
৭। <কুব্জ
৮। =সোজা
৯। <সত্য

আইসব বলে আশা দিলি
গামছা[১] বিছাই রাত গেছে।

(ঝ) অ ল অ ল শিগুইড়ি[২]
যাস না কঁচি শালবনে
খুদি[৩] বরহ্ইল[৪] বিঁধি দিলে
মরবি ল তুই জলনে।

(ঞ) লাইন ধারে ঘর তুলেছি
তায় দিয়েছি দরজা
আইস আইস পান খাঁয়ে[৫] যাও
অহে লইতন[৬] দারগা[৭]।

(ট) বিষ্টুপুরের মিহি চাদর
উড়ে গেলে ধরইব না
যার সঁগে যার বিবাদ আছে
প্রাণ গেলে রা কাঢ়ব[৮] না।

(ঠ) বাড়ি নাম্হয় কুঁয়া[৯] কুইড়লাম[১০]
ঘটি ভরে জল খাব
এমনই কুঁয়া নিঠুর হইল
পদ্ম ফুল ফুটি গেল।

(ড) মন ভুলাব মিঠা শরবতে
নাগর করইব ল বেছে বেছে।

১। শ্রমজীবী আদিম নরনারীর প্রতিদিনের প্রয়োজনে এবং প্রিয় মিলনে 'গামছা'র একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে।
২। কচি তরুণী
৩। <ক্ষুদ্র
৪। বোলতা।
৫। =খেয়ে
৬। =নূতন,
৭। =দারোগা
৮। রা কাঢ়া=কথা বলা
৯। =কুয়ো
১০। =খুঁড়লাম

যার দেখিব লম্বা কাঁছা[১]
তার পেছনে যাব যেঁতে[২]।

(ঢ) চল যাব চল মহুল বাগানে
তথে লিব ল মনে মনে
পাড়ার লকে বলবে তথে
আনলি কত টাকা গুনে।

(ণ) কই দিলি রে গলা পৈঁচা
কই দিলি রে আগবালা
লুলুক[৩] দিবার কথা ছিল
কই দিলি রে খালভরা[৪]।

(ত) রকম সকম অইন্ত রকম
দেখা গেল তর এইবারে
এবার গেলি লইতন নাগরে
আর কি ভাল বাসবি আমারে।

(থ) বনের বাঁধকে জলকে গেলাম
চোরের বড় হুমহুমি
নাক ছিঁড়ে নথ নিয়ে নিল
নাম রৈল কলঙ্কিনী
কলঙ্কের বাজারে বসি
কলঙ্কের কি ভয় রাখি
যার কলঙ্ক সে মেটাবে
লকের[৫] কথায় হয় বা কি!

১। =কোঁচা
২। =যেতে
৩। =নোলক
৪। একটি মারাত্মক গালাগালি কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে এই রূঢ় শব্দটি অনুরাগে দীপ্ত হয়ে ওঠে। বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কণ্ঠে উচ্চারিত হলে ধলভূমের মাটিতে শব্দখানি সেই ধরণের গালাগালির রূপ ধারণ করে যা শোনার জন্য অপরাধের পুনরাবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা জাগে।
৫। =লোকের

(দ) ভাইলছ[১] কথা বইলছ নাই কেনে
আঘাত দিছ গ দারুণ মনে।
খুল্লাখুলি[২] বল না কথা কি আছে ল তর মনে
কেন ধনী চাঁদবদনী দাঁড়াই আছিস অভিমানে।

(ধ) আর পরাণে দিও না খঁটা
যেমন লাগে শেঁওয়াকুইলের[৩] কাঁটা।
বইলছ কথা যেমন বঁধু কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা
তুমার আশায় বইসেছিলাম আমি হে রাইত ভুটা।

(ন) কত ফুল ফুইটেছে বাবুর বাগানে
আনব ল ফুল গাঁথব ল ফুল
পর্ হব ল আমরা দুজনে
কত ফুল ফুইটেছে বাবুর বাগানে।

এই শ্রেণীর একাধিক গানে অসামাজিক প্রণয়ের সসঙ্কোচ স্বীকৃতি মৃদুকণ্ঠে উচ্চারিত।

(ক) আঁধার ঘরে ছঁচ গুইলেছি
ভাসুর বলে জানি না
অ ভাসুর তর পায়ে পড়ি
দিদিকে তুই বলিস না।

(খ) বাড়ী নাম্‌হয় নীল বুনেছি
নীলে গুঁটি ধরে না
ঘরে আছে লক্ষণ দেওর
নীল পাহ্‌ইড়া বই পর্‌হে না।

তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত (বা বড়জোর সম্প্রদায়গত) সংবাদ, আঞ্চলিক সংবাদ কদাচ নয়। কয়েকটি গীতে অবৈধ সম্পর্কের ইঙ্গিত থাকলেও সেগুলিকে এই অঞ্চলের মানুষের স্বাভাবিক জীবনধর্ম বলে উল্লেখ করলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

১। =তাকিয়ে দেখছ
২। =খোলাখুলি
৩। =টোপাকুল

বাঁদনা গীতের মতো টুসুগীতেও বৃন্দাবনের বংশীধ্বনি বারংবার শ্রুত। তবে এর আবেদন আদৌ আধ্যাত্মিক নয়, একান্তই মানবিক। রাধাকৃষ্ণ এখানে তরুণ-তরুণীর রাগ-অনুরাগের অনন্ত সিম্বল। এই সূত্রেই সুবনরেখা[১]র তটভূমি প্লাবিত হয়েছে যমুনার জলে। এখানের পরবক্ষেত্রগুলি আদিম যৌবনের অবাধ লীলাভূমি ; এই অঞ্চলে তরুণ তরুণীদের যৌবন-স্বপ্নের স্বর্গ-ভূমি। তরুণীর আঁখির কোণে কামনার কটাক্ষ, তরুণের কণ্ঠে টুসুগীতের অছিলায় উষ্ণ আমন্ত্রণের নগ্ন প্রকাশ। সেই আদিম কামনার প্রগলভ প্রকাশ কচিৎ কখনো সংযত হয়েছে কৃষ্ণকথার নামাবলি গায়ে দিয়ে।

ডুয়ার সিনী[২]র ধারে ধারে বড় বড় কাশিয়া
ঐ কাশিয়া কাইটতে গেলে জড়া বাঁশী বাজিয়া।
তর বাঁশী ভাই মানা শুনে না
কত ছল করি যাই যবুনা।

ডুয়ারসিনী কাশবনে কাশ কাটতে গিয়েছে যে বংশীবাদক তরুণটি, বৃন্দাবনের চিরকিশোরটির মতোই, বাঁশী বাজানোর সময়-অসময় জ্ঞান তার নেই। মুস্কিল হয় গৃহকর্মরতা, গুরুজনভীতা, বংশীধ্বনি-শ্রবণ-মুগ্ধা তরুণীটির। বাঁশীর ইঙ্গিত-পথ অনুসরণ করে অভিসারে বেরিয়ে পড়তে হয় কত ছল করে। এ সবই এখানের মাটির কথা এবং খাঁটি কথা। কিন্তু ডুয়ারসিনীতে যমুনার জলপ্রবাহ কেমন করে আছড়ে পড়ল সে কথা এখানের ভূগোলে নেই, তার ইতিহাস আছে লোকসংস্কৃতির মর্মের গভীরে।

একটি গীতে কৃষ্ণ নয়, রাধাকে পাই বংশীবাদক রূপে। অথচ এই রাধার বংশীধ্বনিতে আকুল হয়েছে যে, সে পুরুষ নয়, নারী। সন্দেহ হয়, এখানে রাধাই কৃষ্ণের স্থলাভিষিক্তা। স্মরণীয় যে, এরূপ লিঙ্গ বিপর্যয় এই অঞ্চলের লোকগীতে বিরল নয়[৩]। তাছাড়া রাধা বা কৃষ্ণ যাই হোক না কেন নামটি এখানে অসামাজিক প্রণয়ের প্রতীক ছাড়া আর কিছু নয়। পার্থিব প্রণয় অপার্থিব প্রণয়ের অনভ্যস্ত পোষাকে প্রিয়তমকে সাজাতে গিয়ে পীতাম্বরের পরিবর্তে নীলাম্বরী পরিয়ে বসে আছে।

১। <স্বর্ণরেখা (ধলভূমের প্রসিদ্ধ নদী)
২। স্থান নাম
৩। 'সাহিত্য সম্পর্কিত' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

রাধা যখন বাজায় বাঁশী
আমি তখন হাঁড়শাইলে[১]।
কি করি বাহ্‌রাইব[২] রাধা
শ্বশুর গ দুয়ার ধারে।
হাঁড়ি লইলাম কলসী লইলাম
নদীতে যাইতে
কি করি ডাকিব রাধা
দেশুর[৩] আছে পিছনে।[৪]

অদ্ভিন্নযৌবনা টুসু ভাদ্রমাসের ভাদু পূজার দিনেও নীল শাড়ি পরতে চায় না; তাই বংশীধারীকে অনুরোধ করা হয়েছে বুঝিয়ে বুঝিয়ে টুসুকে নীল শাড়ি পরতে রাজি করানোর জন্য।

ভাদর মাসে ভাদু পূজা
সবাই পর্‌হে নীল শাড়ি
আমার টুসু অবুঝদারী
বুঝাও হে বংশীধারী।

এত লোক থাকতে টুসুকে বোঝানোর জন্য বেছে বেছে বংশীধারীকেই কেন ডাকা হল, তার উত্তর আছে এই অঞ্চলের জনমানসে চির-উজ্জ্বল বৃন্দাবন ভাবনার মধ্যে।

বংশীধারীর প্রতি এই অনুরোধটুকু যে অকারণ বা অনপেক্ষিত নয় অভিসারিকা টুসুকে প্রত্যক্ষ করে তার অসংশয়িত প্রমাণ পাই।

কলাতলায় বাট রাখ্যেছি
পাছে টুসু পার হছে।
নন্দের বেটা চিকন কালা
সে ত বাঁশী বাজাছে।

১। =যেখানে হাঁড়ি ইত্যাদি থাকে, অর্থাৎ রান্নাঘরে।

২। বের হব।

৩। <দেবর

৪। যাঁরা লোকসঙ্গীতে সমাজ-বিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে এই অঞ্চলের দুটি বিশেষ নরনারীর (দেবর-ভ্রাতৃবধু) মধ্যে অগম্যাগমন সম্পর্ক আবিষ্কার করেন এই গীতটি তাঁদের বিপাকে ফেলবে। কেননা দেখা যাচ্ছে যে, দেবর এখানে অসামাজিক সম্পর্কের নায়ক বা পরিপোষক নয়, প্রধান প্রতিবন্ধক।

ধলভূমের মানসকন্যা টুসু এখানে বৃন্দাবনের চিরকিশোরীর স্থলাভিষিক্তা। দেবতাকে প্রিয় করার জন্য যেটুকু মনন এবং নিষ্ঠার প্রয়োজন তা হয়ত এদের নেই, কিন্তু প্রিয়কে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস ও আন্তরিকতাটুকু অবশ্যই আছে। এখানের প্রণয় গীতে রাধাকৃষ্ণের নাম এবং প্রসঙ্গ বারংবার শ্রুত। এখানের মাটি ও মানুষ কীর্তন গানে আজও মুখরিত। টুসুগীতে শুনি –

কুল্‌হিমুড়ায় পাথর গাড়া
 শানখিতলের গান হইছে[১]
চল ল সবে শুইনতে যাব
 রাধিকা মিলন হইছে।

টুসুগীতের আনন্দ-সানে বৃন্দাবন-কথা যে কত বিচিত্ররূপে প্রকাশ পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রাকৃত প্রণয় বারেবারে অপ্রাকৃত প্রণয়ের ছদ্মবেশ পরিধান করেছে। খণ্ডিতা নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বৃন্দাবনের সখীদের কণ্ঠস্বর।

কাল ভমর পিরীত জানে না।
রাধার কুঞ্জে যেতে দিব না।
ছাপা পাহিড়া[২] লীল শাড়ি
 এমন কভু দেখি না।
যাও ফিরে যাও অ কালসনা
রাধার কুঞ্জে তুমি দেখাও না।

আসল কথা এই যে, ধলভূমের মাটিতে বৃন্দাবনের স্মৃতি অত্যন্ত সজাগ এবং এখানের লোকগীতে সে স্মৃতির সুর ও স্বপ্ন বারেবারে উচ্চকিত।

কাশী যাব পৈরাগ[৩] যাব
 আর যাব বিন্দাবন।
ঘুইরবার পথে দেখি আইসব
 তমালেরি তরুবন।

১। =হচ্ছে।
২। =ছাপা পাড় যুক্ত
৩। <প্রয়াগ

সইত্যি বন্দী কর রাজা
আমুল ভাল করিব।

(ঘ) জিয়ের[1] জালাতে রাজা
সইত্যি বন্দী করিল
রামলক্ষণকে বনে পাঠাই
ভরতকে রাজ্য দিল।

(ঙ) রাম ন কি[2]রে বনে যাবি
বনে গেলে খাবি কি
বনে আছে সকইল ফল মা
বনে খাবার ভাবনা কি।

(চ) মাথায় জ'টা তিন ফুল কাঁটা
পর্হ রাম গাছের বাকল
যখন রাম সাজিল বনে
বাকল করে ঝলমল।

(ছ) ও রামের মা ও রামের মা
দেখ গ রামের দুদ্দশা[3]
বস্তর[4] বিনু[5] গাছের বাকল
তেল বিনু মাথায় জ'টা।

(জ) রামের মা কোওশইল্যা রাণী
লক্ষণের মা সুমিত্র্রা
ভরতের মা কৈকয়রাণী
বনে গেল রামসীতা।

১। =জীবনের (জিয় <জীব)
২। =নাকি।
৩। <দুর্দ
৪। <বস্ত্র
৫। =বিনা, বিহীন

(ঝ) বাজারে বাজারী[১] কাঁদে
ডালে কাঁদে ককিলা[২]
রাজার মহালে কাঁদে
কোওশইল্যা জননীরা।

(ঞ) উপরে সুরুজের[৩] ছটা
নাম্‌হয়[৪] তাতা বালি গ
চলিতে না পারে সীতা
করিছে বিকলি গ।

(ট) রাম ভাঙিলেন তরুডাল মা
লক্ষণ ধইরলেন মূলেতে
তাহার ছায়াতে সীতা
চলেন ধীরে ধীরেতে।

(ঠ) আমার আঙিনা মাঝে
সনার হরিণ যায় চইল্যে
ঘরে আছে লক্ষণ দেওর
সনার মিরগী দাও ধইর‍্যে।

(ড) অসকবনে[৫] পাতের কুঁইড়্যা[৬]
সীতা পাশা খেইল্যেছে
যুগীর[৭] ভেশে[৮] রাবণ আইসে
সীতা হরণ কইর‍্যেছে।

(ঢ) কুটীরেতে ছিল সীতা
কথা গেল কে জানে

১। =যারা বাজার করে (ক্রেতা বিক্রেতার দল)
২। =কোকিল (স্ত্রী)
৩। সূর্যের
৪। =নীচে
৫। =অশোক বনে
৬। =কুটীর
৭। =যোগীর
৮। =বেশে

দিশাহারা হয়ে রাম
কাঁদিছে বনে বনে।

(ণ) অশোক বনে কাঁইদছ সীতা
অসকেরি[১] ডাল ধইর‍্যে
আর রদন[২] কইর না সীতা
গাছের বাকল যায় ঝইর‍্যে।

(প) কাঁদ কেন মা জানকী
কাঁদিলে কি আর হবে
স্বপনে দেখিলাম আমি
লঙ্কাতে রাম আসিছে[৩]।

(ফ) বাঁদর বুলে ডালে ডালে
বাঁদরের কি পা ভোলে
রামসীতাকে বনে দিয়ে
বইসে আছে গাছতলে।

(ব) সমুন্দর[৪] পাহ্‌রাইল[৫] হনু
শ্বেত মাছির ভেস ধইর‍্যে
রামের হাতের অঙ্গুরীটি
পইড়ল সীতার আঁচলে।

(ভ সীতা হরণ কল্লি[৬] রাবণ
রাখবি রে কেমন কইর‍্যে
দেইখব রে তর সনার লঙ্কা
দিব রে ডাহান কইর‍্যো।

১। =অশোকের
২। =রোদন
৩। অতীতকাল (=আসিয়াছে)।
৪। <সমুদ্র
৫। =পার হল
৬। =করলি

(ন) রাবণ রাজার এক শ বেটা
সুয়া[১] লইক্ষ লাতি[২]
একটিও রাম রাখি নাই দেয়
বংশে দিতে বাতি।

(য) রাম ছাইড়েছেন যঁইগ্‌গের[৩] ঘঁড়া[৪]
তপুবনের কানালে
লবকুঁশে ধইর‍্যেছে ঘঁড়া
সীতায় বলে দাও ছাইড়্যে।

(র) ছাইড়ব না ছাইড়ব না ঘঁড়া
ছাইড়ব না কন মতে
আমার সঁগে[৫] যুদ্ধ দিবেক
দেইখব কেমন বীর বঠে[৬]।

টুসুগীতে রাম-কথা বর্ণিত হয়েছে বেদনার ভাষায়—অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে। টুসুগীতে রামায়ণের সেই অংশগুলিই বেশী স্থান লাভ করেছে যেগুলি করুণ ও বিধুর। বোধকরি টুসুকে জলে দেবার এবং রামকে বনে দেবার দুঃখ ও বেদনাকে একই সূত্রে বাঁধতে চেয়েছে এই ভূখণ্ডের মানুষগুলি—তাদের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে।

টুসুগীতের স্মৃতিচিত্রে মহীরাবণ পালাটুকু সংক্ষিপ্ত হলেও সুন্দর এবং দেশজ রামায়ণের সম্পূর্ণ অনুগত।

যত কুলনারী যত কুলনারী
কলসী কাঁখে জল আনে সারি সারি।
মর্ত্ত[৭] হতে মহীরাজা গ এনেছে নর ধরি।
সুড়ুঙ্গের[৮] ভিতরে হনুমান চলে অতি সত্বরে
উপনীত হয় গিএ সেই যে মায়ের মন্দিরে।

১। =সোয়া
২। =নাতি
৩। =যজ্ঞের
৪। =ঘোড়া
৫। =সঙ্গে
৬। =বটে
৭। < মর্ত
৮। =সুড়ঙ্গের

বলবে হে আমরা রাজার ছেলে না জানি নমস্কার
নমস্কার করিঞ মহীকে দেখাল দুজনেতে
হনুমান তখন মায়ের খাঁড়া আনি
মহীরে দিল বলি।
যত কুলনারী গ যত কুলনারী……

রামকথা প্রসঙ্গে এখানের মানুষের সম্ভ্রমবোধের সাক্ষর আছে রংয়ের গান-গুলিতে। সাধারণতঃ রঙের গানের ভাব লঘু ও তরল এবং সুর চটুল হয়ে থাকে। তরুণ-তরুণীর কণ্ঠে এই গান প্রায় ক্ষেত্রেই প্রসঙ্গ ও শ্লীলতার সর্ববিধ সীমাকে অতিক্রম করে যায় যৌবনের অত্যুৎসাহে। টুসুগীতে যখন রামসীতার কাহিনী বর্ণিত হয় তখন কিন্তু রংয়ের গানগুলি প্রসঙ্গ পরিহার করে না এবং শ্লীলতার সীমাও অতিক্রম করে না। এক্ষেত্রে রংয়ের গানের ছন্দ দ্রুতলয়ে বেজে উঠলেও ভাবটি ধীরলয়েই শান্ত থেকে মূলভাবেরই পরিপোষকতা করে। এরূপ ক্ষেত্রে যে সব রংয়ের গান গীত হয় তার নমুনা—

(ক) রাম কাঁদে বনে
সীতা হইর‍্যে লিল রাবণে।

(খ) দে মাঁ বিদাই সঙ্ চইলে যাছে
আমি রহ্ইব না কন মতে॥

টুসুগীত আনুষ্ঠানিক (ceremonial) গীতি—টুসুকে কেন্দ্র করেই এগুলির উদ্ভব ও উল্লাস। অন্যান্য আনুষ্ঠানিক গীতের মতো এগুলিকে নির্দিষ্ট সময়েই গাইতে হয়, অন্য সময় গাইতে নেই। এ বিষয়ে লোকসংস্কারের সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ আছে। মকর ছাড়া অন্য সময় গাইলে ফড়া[১] হয়, নানাবিধ চর্মরোগ হয়। আসল কথাটা এই যে, বাছুর কাছে না এলে যেমন গোরুর বাঁটে দুধ আসে না, পরব না পৌঁছলে এদের প্রাণেও তেমনি সুরের উন্মাদনা ও গানের উল্লাস অনুভূত হয় না। প্রবহমান স্রোতধারা যেমন বড়ো পাথরের সম্মুখীন হয়ে প্রবল জলতরঙ্গে আছড়ে পড়ে, বড়ো বড়ো পরব বা উৎসবগুলির সমাগমে এখানের খেটে-খাওয়া মানুষগুলির গতানুগতিকতাবদ্ধ নিস্তরঙ্গ জীবনেও তেমনি নৃত্যগীতের উন্মাদনা সঞ্চারিত হয়। মত্ত আবেগে হাতে বাজে মাদল[২], কণ্ঠে গান, দেহের বিচিত্র ভঙ্গিমায় নৃত্যের লীলায়িত ছন্দ।

১। =ফোড়া
২। আঞ্চলিক উচ্চারণে 'মাদইল'

এখানে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান-গীতির পাশাপাশি এমন কিছু গীতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যেগুলি অনুষ্ঠানটির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কশূন্য। এগুলিকে বলা যেতে পারে আনন্দগীতি। অ-সংস্কৃত আদিম মানুষের অনাবৃত প্রকাশ এই গানগুলি। অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক গানগুলিকে যদি পূজার গান বলি, এগুলিকে তাহলে বলতে হয় মজার গান। বাঁদনা গীতে এগুলিকে বলে 'ডহরিয়া'[১], টুসুগীতে এগুলির নাম 'রং.।

রংয়ের অর্থ আমোদ-প্রমোদ, হাসি ঠাট্টা, পরিহাস-রসিকতা। 'রং· করা' মানে ঠাট্টা করা, পরিহাস করা।[২] রংয়ের গান মানে আনন্দ-আমোদের গান। এ গান তাই একান্তরূপেই চপল ও চটুল এবং লক্ষণীয় রূপেই হৃদয়-সংবাদী। আনুষ্ঠানিক গানগুলিকে যদি গোষ্ঠীগীতি বলি, এগুলিকে তাহলে বলতে হয় ব্যক্তিগীতি—যদিও এদের মালিকানা গোষ্ঠীরই হাতে।

শুধু বাঁদনা আর মকর নয়, অন্যান্য উৎসব বা অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক গীতের শেষেও 'রং'য়ের গান গীত হয়ে থাকে। করমগীত করম পূজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক-যুক্ত এবং একান্তরূপেই আনুষ্ঠানিক গীতি। সেখানেও দেখি যে, মূল গানটি (অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক গীতটি) শেষ করেই গায়ক (বা গায়িকা) একটি রংয়ের গান ধরেন। এই রংয়ের গীতের ভাব, লয়, সুর ছন্দ মূল গান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ভূমিজ সম্প্রদায়ের একটি করমগীত রং-সহ নিয়ে উদ্ধৃত হল—

ঠেকা টুপা লিয়ে ছেইলো[৩]
খেলিতে বাহিরাইল রে
খেলিতে খেলিতে ছেইলা মায়ে পাসুরাইল[৪] রে
অভাগী মায়ের ছাতি বিদূরে যায় রে॥
ছটকী বহু বড়কী বহু ধান গ শুকায় নাই।
আওয়া ধানের মাড় গ দিদি মনকে আসে নাই।

১। দ্রষ্টব্য—এই লেখকের 'ধলভূমের লোকগীতি' (প্রথম খণ্ড : বাঁদনা)

২। তুলনীয় এই অঞ্চলের প্রবাদ 'রং করতে করতে ঢং হওয়া' অর্থাৎ হাসি ঠাট্টা থেকে আপদ বা অনর্থের সূচনা হওয়া।

৩। =ছেলে

৪। =ভুলে গেল

এখানে শেষ দুই পংক্তিই রং[১]। মূলগানে মাদলের বোল ছিল—গেজ্‌তা গেজ্‌তা খিন। রং শুরু হতেই মাদলের বোল বদলে গেল—দেদ্‌ধা ইরি ধা ধা/ ইরি ধা ধা।

লোকগীতির পালাগানে রংয়ের গান অনেকটা যেন গুরুগম্ভীর নাটকের বুকে কমিক-রিলিফ। মনসাভাসাতে (এবং কচিৎ ঝুমুরে) এই 'রং' গুলিই ধ্রুবপদ।

সঙ্গীত শাস্ত্রের বিচারে মকরের গীতগুলিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। একটিকে বলা যেতে পারে ধ্রুপদ, অপরটি দাদরা।[২] প্রথমটির লয় বিলম্বিত, দ্বিতীয়টির দ্রুত। সাধারণতঃ বিলম্বিত লয়ের গানটির উপসংহার হয় দ্রুত লয়ের দুটি পংক্তিতে। এগুলিই টুসুগীতের রং। যেমন—

কাল দেখে নাম্‌লাম জলে
জল হইল মর[৩] এক গলা
অ প্রাণনাথ ছাঁইকে তুল
রং দেখিবার লয় বেলা॥
সে কি অমনি যাব
অই ছঁড়িদের হাড় কুইটে দলান[৪] দিব।

এখানে 'রং' শেষোক্ত দুটি পংক্তিতে—যে গুলি মূল গীতটির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কশূন্য এবং পরিহাসই যার প্রাণ।

অন্যান্য অনুষ্ঠানে (যেমন বাঁদনা বা করম ইত্যাদি) পূজার গান ও মজার গানের পরিমাণ প্রায় সমান সমান। টুসু-গীতে কিন্তু মজার গানগুলির প্রাধান্য। তার একটা প্রধান কারণ বোধহয় এই যে, টুসু ঠিক দেবীর পর্যায়ে পড়ে না এবং তার পূজায় ভক্তি অপেক্ষা স্নেহের অংশটাই বেশী। এই জন্যই টুসুগীতের যে অংশটি অসংশয়িত রূপে অনুষ্ঠানগীতি অর্থাৎ পূজার গান সেখানেও ভক্তিরস নয়, মানব (human) রসেরই একাধিপত্য।

১। সব সময় যে মূল গানের সঙ্গে নির্দিষ্ট রংয়ের গানটিই গীত হয় তা নয়। গায়কের খেয়াল খুশী মতো যে-কোনো গানের সঙ্গে যে-কোনো রংয়ের গান গীত হয়।

২। নিখুঁত বিচারে একটির রাগ ঝিঁঝিট, তাল ঝাঁপতাল, মাত্রা ১০, অপরটির রাগ মিশ্র ঝিঁঝিট, তাল দাদরা, মাত্রা ৬

৩। =মোর।

৪। =দালান (=পাকাবাড়ি)

টুসুগীতের রংয়ের গানগুলিকেও দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। টুসুগীতের যারা গায়ক তাদের দুটি দল—প্রথম দলে পড়ে বালিকা ও কিশোরীরা, যারা টুসু পাতে, টুসুর পূজা করে এবং গীত গায়; দ্বিতীয় দলে পড়ে তরুণ তরুণীর দল, যারা এই উপলক্ষে মনের আনন্দে নাচে, গায় ও মাদল বাজায়। এই উভয় শ্রেণীর গায়কের বয়স, মানসিকতা ও চিন্তাভাবনার মধ্যে যে পার্থক্য, টুসুগীতের রংয়ের গানের দুটি শ্রেণীর মধ্যেও সেই পার্থক্য। কিশোরী-কণ্ঠে গীত রংয়ের গানগুলির সুর ও ছন্দ চটুল হলেও ভাবটি সরল ও মৃদু এবং তাতে কাঁচা মনের ছোঁওয়াটুকু অনায়াসলভ্য। যেমন—

(ক) মাথা বাঁইধব কিসে
মাথা বাঁধা দড়ি রৈল বিদেশে।

(খ) মকর বিন্দাবন[1]
টুসু মায়ের শ্রীচরণ।

(গ) বাঁধা কপির বার আনা দর
অ খেঁদানাথী তুই ছাইড়ে পড়। ইত্যাদি।

(ঘ) দে মা মাথায় কাঁটা
পাটায় বইস্যে বাঁইধব গ কলেজ খঁপা।

(ঙ) গেতাঁ মাছের কাঁটা
অভাগিনী খালি ল ভাইয়ের মাথা।

(চ) আমি রাজনন্দিনী
স্বামী আমার রামচন্দর রঘুমণি।

(ছ) রাজার কাগজি তলে
ক্ষ্যাপা হাতি ডাল ভাইঙ্গে খেলা করে।

(জ) ধর পাঙ্খা দরজায় বইসে
আমার টুসুধনকে ঘাম দিছে।

(ঝ) উইঠে গেল মাথার জাল কাঁটা
তরা লায়লিন[2] ফিতায় দে আঁটা।

(ঞ) উটি কি গাছ বটে
কত রেনা ফুল ফুইটে দাঁড়াই আছে।

১। <বৃন্দাবন।
২। =নাইলন

(ট) গড়্ গড়্ হুকা টানে
আমার টুসু আইসছে দশটার টেনে[১]।

(ঠ) টুসু লাও না কেশে
লক্ষ্মীবিলাস তেল উইঠেছে এই দেশে।

(ড) কাইলের মেঘবাদলে
খিলি সাজা রইল রৈল টুসুর আঁচলে।

এগুলিও রং—তবে সেটা বাল্য-কৈশোরের সবুজ রং—শিশিরস্নাত, মৃদু ও মধুর। মকরগীতের আসল রংয়ের গানগুলি তরুণ-তরুণীদের যৌবন-স্বপ্নের লীলাভূমি। সেগুলির সুর ও ভাব দুইই চটুল ও চপল। সেগুলি শুধু যে যৌবনের গান তাই নয়, ক্ষেত্রবিশেষে অত্যন্ত যৌন-গন্ধী এবং সেই কারণে কিছুটা অশ্লীলও। তবে স্থান-কাল-পরিবেশের সঙ্গে আশ্চর্য মানানসই বলে পরব-প্রাঙ্গণে সেগুলি আদৌ অশ্লীল ঠেকে না। মুস্কিল হয় তাদের ছাপার অক্ষরে স্থান দিতে গেলেই।[২] বন্যরা বনে সুন্দর, কিন্তু সভ্য সমাজের পোষাকী চোখে তাদের কিছুটা বিসদৃশ ঠেকে।

টুসুগীতের এই রংয়ের গানগুলি জীবন-বসন্তের মধুর কলকাকলিতে পরিপূর্ণ। যৌবনের উগ্র রাগে এগুলি আগাগোড়া অনুরঞ্জিত। এগুলি এই অঞ্চলের তরুণ-তরুণীদের যৌবন গীতি, উত্তর-প্রত্যুত্তর মূলক এক বিচিত্র কবি-গান। তরুণ-তরুণীদের রসকলহকে কেন্দ্র করেই অধিকাংশ গানের জন্ম। এই গানগুলির মধ্যে দিয়েই তাদের চোখ ঠারাঠারির, মন জানাজানির শত সহস্র প্রয়াস। লোকায়ত যৌবন অবশ্যই অতীন্দ্রিয়বাদী নয়, অনস্বীকার্যরূপেই দেহবাদী। কিন্তু তাই বলে এদের প্রেম একান্তরূপেই দেহকেন্দ্রিক একথা বলা এই মানুষগুলিকে অপমান করারই সমতুল্য। পৃথক্ প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়েছি যে, এই ভূখণ্ডের মানব-মানবীর প্রেমে দেহের একটি প্রধান ভূমিকা থাকলেও সেই দেহ মনকে বাদ দিয়ে নয়।[৩] মনের মানুষ ছাড়া অন্যের কাছে অসঙ্কোচে আত্মনিবেদন এদের আচারশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র

১। <ট্রেনে

২। অসংখ্য রংয়ের গান যে আমাদের সঙ্কলনে স্থান পায় নি তার কারণটা এখানেই।

৩। দ্রষ্টব্য—'ধলভূমের পাতাগীতে নারী', সাহিত্যের সম্পর্কিত,
ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা।

কুসুমের মতো এরাও 'অত শস্তা নয়'। টুসু গানে মন জানাজানি, মন চেনা-চিনির যে বিচিত্র কৌশল, তার শেষ লক্ষ্য দেহ হলেও মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়েই তার পথযাত্রা। যারা প্রাপ্তিটাকেই পরম জ্ঞান করে পথের সৌন্দর্যকে অবহেলা করে তারা আক্ষরিক অর্থেই অন্ধ। নিছক দেহবাসী প্রেমের পক্ষে একথা বলা কিছুতেই সম্ভব নয় যে,

আমরা রা কাড়ি নাই লক বাদী
মুঁহে হাঁসি চইখে ভাব রাখি।[১]

মুখের একটু হাসি, চোখের একটু ইশারা যে প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে সে প্রেমকে আর যাই হোক দেহবাদী আখ্যা দিতে আমরা অপারগ। প্রকৃত সত্য এই যে, প্রেমের আকর্ষণে এরা ঘর ছাড়তে রাজি, পথের সঙ্গীটি যদি মনের মানুষ হয় তবেই।

আমার লাচনী হবার সাধ ছিল
গাঁয়ের রসিক[২] বায়েন কাই হইল।

'রসিক বায়েনের' সঙ্গত ছাড়া এরা 'লাচনী' (নাচনী) হয় না, হতে পারে না, এই অঞ্চলের লোকগীতির আলোচনায় একথা অবশ্যই স্মরণীয়।

এই রংয়ের গীতগুলির আকার সংক্ষিপ্ত হলেও এগুলির আঘাত প্রচণ্ড, আকর্ষণ অত্যধিক। এ গুলির ভার নেই কিন্তু ধার আছে। আঘাত বা অনুরাগ উভয়ক্ষেত্রেই এর আবেদন অনস্বীকার্য ও অব্যর্থ। যখন শুনি—

"তুই হাঁসি দিলি কন[৩] দোষে
তর দাঁতে কি সরুই[৪] লাগিছে",—তখন বুঝতে পারি যে,

প্রতিপক্ষের উপহাসের এই হল মুখের মতো জবাব, মোক্ষম প্রত্যুত্তর।

১। তুলনীয় এই অঞ্চলের একটি ডুবাং গীত—

দিনে ল পান রুপি
রাইতে ল গুয়া
মুঁহের পান রুপি জলে পড়িল।
হাতেত মাদইল বাজিল
চইখে ত কথা বলিল।

২। রসিক শব্দটি এখানে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। নাঁচনী (লাচনী)-র রক্ষক বা পোষ্টাকে বলে 'রসিক'।

৩। =কোন

৪। =এক রকম পোকা।

কাছে পাবার আকাঙ্ক্ষা এবং কাছে ডাকার আকুল আবেদন যে কত অপরূপ এবং অব্যর্থ হতে পারে রঙের গানে তার অজস্র উদাহরণ অনায়াসলভ্য।

তুই দাঁড়ালি অনেক ধুরে[১]
নাম জানি নাই ডাইকব কি করে।

গায়ক বা গায়িকার 'না জানা নামের ঘন যামিনীর মাঝে' অনুরাগের যে শুকতারারাটি জলজল করে জলছে তাকে দেখার জন্য দিব্যদৃষ্টির দরকার হয় না।

টুসুর রঙের গীতে যৌবনের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা বল্গাহীন। আদিম মানব-মানবীর জীবনে মাপা কথা ও চাপা হাসির কোনো স্থান নেই। নাকের সর্দিকে রুমালে বেঁধে ঘরে নিয়ে আসার কৌশলটুকু এদের অজ্ঞাত। এদের অনুরাগ যেমন অতি-স্পষ্ট, আমন্ত্রণের ভাষাও তেমান সর্ব কাপট্যরহিত। মনের মানুষকে এরা কাছে ডাকে সর্ব দেহ-মন দিয়ে, তথাকথিত লাজ-লজ্জা-ভয় সব কিছু বিসর্জন দিয়ে।

অ ভাইয়ের শালা
আজ মাকি যা আমার ঘরে এক বেলা।

এদের দেহের ডাকে এবং মনের ডাকে বিন্দুমাত্র অমিল নেই। সেদিক দিয়ে এরা যথার্থই স্বয়ংবরা, যাকে মন দেয় একমাত্র তার হাতেই এরা নিজেদের সমর্পণ করে। সেই সমর্পণ ভীরু নায়িকার সসঙ্কোচ আত্মনিবেদন নয়, সাহসী তরুণীর সদর্প, সহর্ষ এবং সরব প্রত্যুদগমন।

ডালিম খাই যা রে থালভরা
পাকা ডালিম রসেতে ভরা।

টুসুর রঙের গীতে আঘাত বা অনুরাগের মতো আক্ষেপের রাগও গূঢ় ও গাঢ়।

আমি নাই জানিছিলি বির[২] জালা
জানাই ছিল ডাঙুয়া[৩] থালভরা।

এতদিন মেয়েটির জীবনে অপর যে যন্ত্রণাই থাক না কেন বিরহ-যন্ত্রণার বিচিত্র অনুভূতিটি তার অজ্ঞাতই ছিল। তপ্ত ইক্ষুবর্ণসম সেই প্রেমের আস্বাদ

১। <দূরে
২। =বিরহের
৩। =অবিবাহিত তরুণ

এবং তজ্জাত যন্ত্রণার অনুভূতি সঞ্চারিত হল তার সর্ব দেহমনে সেই দিন থেকে, যেদিন তার মনের আঙিনায় আসন পেতে বসল অজ্ঞাতনামা সেই 'ডাগুয়া খালভরা'। প্রেমের মোহন, মদন এবং দহনরূপের আশ্চর্য সমাহারে স্বল্পাক্ষরা এই পদটি যথার্থই মধুক্ষরা।

সামান্য কয়েকটি শব্দ সুরে সমর্পিত হয়ে অসামান্য অর্থব্যঞ্জনায় কখনো মধুর, কখনো বা বিধুর হয়ে উঠেছে টুসুর রঙের গীতে।

ফুলের মধু ফুলেই শুখাইল[১]
আমার গুণের বঁধু কাই[২] আইল।

অতি-স্পষ্ট অলঙ্কারের আভরণে আদিম বিরহ-ব্যথার দুঃসহ আকুতি অনায়াসে ও অকপটে অভিব্যক্ত।

এই গীতের অলঙ্কারগুলিও লক্ষণীয়। এগুলি এই আদিম নরনারীর আটপৌরে জীবনের আঙিনা থেকেই আহৃত। এগুলির মাধুর্য যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি মনোভাবের নিখুঁত প্রতিফলনে এদের পারদর্শিতাও প্রশংসনীয়। আপাতদৃষ্টিতে এগুলি অসংলগ্ন ও অনপেক্ষিত বলে অনুভূত হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং বক্তব্যের যথার্থ পরিপোষক।

পকরা পকরা পকরা বাইগনে
তদের মনের কথা কে জানে।

পকরা অর্থাৎ পোকা খাওয়া বেগুনের কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মনের কথা জানার সম্ভাবনা খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। এ কিন্তু আবোল-তাবোল নয়, রসিকজন জানেন এর আড়ালে অর্থের অসদ্ভাব নেই। কোন বেগুনের মধ্যে যে পোকা আছে তা অনেক সময় বাইরে থেকে দেখা যায় না; মুখ মনের দর্পণ হলেও প্রায়ক্ষেত্রেই সে দর্পণে মনের আসল কথাগুলি যথার্থরূপে প্রতিবিম্বিত হয় না। ওদের মুখের কথা এবং মনের কথা যে এক নাও হতে পারে পকরা বাইগনের দৃষ্টান্ত দিয়ে সেই কথাটিকেই স্পষ্ট করার প্রয়াস করা হয়েছে। শ্লেষ এবং সৌন্দর্যের সমাহারে পদটি সমুজ্জ্বল।

ফুল বাগানে ফুলের পাপড়িগুলি বিশ্লেষণ না করে ফুলের সাজিটি তুলে ধরাই বোধ করি অধিকতর শ্রেয়।

১। =শুকিয়ে গেল
২। =কই

১। মকর পরবে
তদের[১] পা পড়ে নাই গরবে।

২। বুঢ়া বরে সাঁগা নাই হব ;
বরং তাল গাছে টাঙাই হব।

৩। নদী ধারের চিকচিকি পাথর
তখে[২] দেখলে আমার গা কাতর।

৪। চসমা ঘড়ি দেখে ভুল না
বাবুদের পকেটে নাই চার আনা।

৫। বল দকানী[৩] তেলের কত দর
ও তর[৪] উড়াই দিব দকান ঘর।

৬। মকর পরবে
তর্‌হা[৫] রা কাড় নাই গরবে।

৭। তর্‌হা যতই সাজা
তদের[৬] টুসুর চইখ[৭] দুটি পিঁয়াজ ভাজা।

৮। এক সড়পে[৮] দু সড়পে তিন সড়পে লক চলে
আমার টুসু এমনি চলে বিন বাসাতে[৯] গা হিলে।

৯। হেল্‌কা বাঁকা থালভরার ঘরে
ছানা কাঁইদছে[১০] ল পিঠার তরে।

১০। তানা নানা কানা থালভরা
কাপড় কিনলি রে মাকুচরা।

১। =তোদের
২। =তোকে
৩। =দোকানী
৪। =তোর
৫। =তোরা
৬। =তোদের
৭। =চোখ
৮। =পাকা রাস্তা
৯। <বাতাস (বর্ণ বিপর্যয়); বর্ণ বিপর্যয় ধলভূমের লোক ভাষার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য (লহনা<ছলনা)।
১০। =কান্নাকাটি করছে

১১। তথে পান দিলটা কে বঠে[১]
ডুমকাড়ির[২] হাটে ?

১৩। ভাব কইরে তুই ভাবনা ধরালি
গাছে উঠাই মূলে চট্[৩] দিলি।

১৪। কে উঠাইল দারুণ শাল গাছে
আমার মাথা ঘুরা রগ[৪] আছে।

১৫। যেমন থুপী ঝিঙার বীচ কাল
এত বড় থুবড়া লয়[৫] ভাল।

১৬। ঝিকি সনা প্রাণ কাঁইদে উঠে
আমার প্রাণ জুড়াব কার কাছে।

১৭। করিস না ফটর ফটর
তর দুয়ারে চালাব মটর[৬]।

১৮। লাল জাকিট[৭] কাঁইচের ঝকমকি
তথে রাইতে[৮] দেখায় জুনপুকি[৯]।

১৯। ঝিরি ঝিরি বহে নদীর জল
ও তুই খাবি না সিনাবি বল[১০] ?

২০। আমার রাস্তা দেখে লর[১১] পড়ে
দে মা বিদাই যাই ধীরে ধীরে।

১। =বটে
২। গ্রামনাম।
৩। =চোট
৪। =রোগ
৫। =নয়
৬। =মোটর
৭। জ্যাকেট
৮। =রাত্রে
৯। =জোনাকী
১০। দ্বিতীয় পংক্তিটি এইভাবেও শ্রুত হয়—
'তুই কন ঘাটে সিনাবি বল ?'
১১। =লোর (অশ্রুজল)

২১। তরা সায়া সাড়ি বাস্‌কায়[১] ভর
পয়ব গেল চল সসুর ঘর।

২২। তর গা গরা[২] তর মন মরা
তথে সাজে স্যুট জুতা পর্‌হা।

২৩। তরা জানিস না গীতের গড়া[৩]
লে লিবি ত টাকায় ছ জড়া।

২৪। আমি তর গীতে কি আশ করি
বাড়ি নাম্‌ হয় গীতের চাষ করি।

২৫। জুয়ান ছঁড়ি ইসারা দিছে
সে ত আগাছে আর পেছাছে।

২৬। কাল ছঁড়া মাদইল বাজাছে
সে ত আগাছে আর পেছাছে।

২৭। লিয়াই[৪] লাগ্যে যাবি বল কথায়
তথে বাঁধব ল তুধিলতায়।

২৮। লাগব লিয়াই লারবি[৫] ছাড়াতে
আমার অনেক দিনের রাগ আছে।

২৯। তুই হাঁসি দিলি কন দোষে
তর দাঁতে কি সুরুই লাগিছে।

৩০। দেখ ভাবি দেখ মিছা নাই বলি
আমি তর তরে পাগল হলি।

৩১। একটা নাখে দুটা নাকছাবি
তুই রহবি না বাহইরাই যাবি।

৩২। আমার ননদ অতি সুন্দরী
যেমন ইলিশ মাছের ফুলবড়ি।

১। ইংরেজি Box>বাস্‌কা+য় (সপ্তমী)।
২। =গোর(<গৌর (বর্ণ অর্থে)।
৩। =গোড়া
৪। =ঝগড়া
৫। =পারবি না

৩৩। ঢুমকা বিলাতী
তথে কে কইরল ল পুআতী[১]।

৩৪। তর লুঙ্গি উড়ায় আকাশে
লদী ধারের শীতলি বাতাসে।

৩৫। পাইরব না লতে জল দিতে
ঝিঙ্গাফুল্যা চিড়কাটি রোদে।

৩৬। আমার মন কাঁদে ল তর তরে
যেমন পস্তু কাঁদে গোল আলুর তরে।

৩৭। আলতা পাইড়া চালতা বকুলে
তথে দেখেছিলি পরকুলে[২]।

৩৮। একটি গাছে দুটি গেঁদা ফুল
ও তর ভাতার নাই ত হুলকি বুল[৩]।

৩৯। জাড়া গাছে তাড়া লাগাব
ও তর ভাতার কর‍্যা ছাড়াব।

৪০। হাত দিবি নাই মাচিস কাঠিতে
তুই পারবি না ভাই সামলাতে।

৪১। ঝিরিঝিরি বহে লদীর[৪] জল
তুই কন[৫] ঘাটে সিনাবি বল।

৪২। ঝিরিঝিরি বহে লদীর জল
তুই খাবি না সিনাবি বল।

৪৩। প্রেম পীরিতি দুদিনের খেলা
তুই খেলি লে ল এই বেলা।

৪৪। তুই ভুলালি ল ভুলালি
চিনি বলি গুড়ের চা দিলি।

১। =পোয়াতি (<পুত্রবতী)।
২। বাঁকুড়ার একটি স্থান, এখানে মকরের খেলা হয়।
৩। হুলকা=এদিক ওদিক তাকানো
৪। =নদীর
৫। =কোন

৪৫। কথা বলবি কিসে
আমরা উড়াই দিব ইংলিসে।

৪৬। তুই পিঠা লিবি জল খাতে
দিগড়ি[1] যাবি মকর সিনাতে।

৪৭। আমার রহ্‌ইল মনের বেদনা।
কইলে কথা জবাব দিব না।

৪৮। তখে জানলি অরে থালভরা
তর পিরিতে এমনই ফরা।[2]

৪৯। তুই যে ধনী নয়ানের কাজল
তখে না দেখিলে মন পাগল।

৫০। ঢুলঢুলি ল ঢুলঢুলি
কুল গেলে তর দিব কুলকুলি।

৫১। ডাঁইগল লিখা[3] পড়ইল চাক ছুটি
তদের রহইল মনের কুটকুটি।

৫২। ভাদর আশিন মাসে
ঘাটশীলাতে সখের বিঁধা হাট বসে।

৫৩। তুই ডাকছ যে ল আয় বলি
কিয়া লাটায় যাব কি করি।

৫৪। মারব ঘানা[4] ভাঙব চাটানি[5]
আমরা ছানা-বুঢ়া নাই চিনি।

৫৫। তখে ভাগাব ল ভাগাব
তর দুয়ারে আদা লাগাব।

১। ধলভূমের একটি গ্রামের নাম। এখানের মকর মেলা বিখ্যাত।
২। =শূন্য।
৩। গোরুর গাড়ির ঘুষদণ্ড
৪। =ঘান (বড় হাতুড়ি)
৫। =বিরাট পাথরের স্তুংরি (=ছোট পাহাড় যা মাত্র দু একটি বিরাট পাথরের সমবায়ে গঠিত)

৫৬। ধারে ধারে নাম লিখা
কন[১] দকানে[২] লিলি[৩] রে ছাতা।

৫৭। তুই আসবি টুকুন সাঁঝ হলে
কুল্‌হি মুড়ার[৪] গুলাচ[৫] গাছ তলে।

৫৮। তর মিটিক মারা[৬] ঘুচাব
আপটাই পালে এইড্যাই[৭] মু বাঁকাব।

৫৯। তর কিরা ল তখেই ফম[৮] করি
আমি ঘরের কাজে ভুল করি।

৬০। ছি ছি লাজে মরি
আমরা হলে লিথম[৯] ল গলায় দড়ি।

৬১। তুমি নাগর বড়ই ভুলালে
কানে কানপাশা হে কাই[১০] দিলে।

৬২। তুই ঘুরবি ল আমার কিরা
ডালিম রসে ভিজাব চিঁড়া।

৬৩। আমি নাই জানি বির[১১] জ্বালা
জানাই দিল ডাঁগুয়া[১২] থালভরা।

৬৪। ছি ছি লাজে মরি
কথা বলিস না আর যা ঘুরি।

১। =কোন
২। =দোকানে
৩। =নিলে
৪। =প্রান্তস্থিত
৫। <গুলঞ্চ
৬। মিটিক মারা=চোখের ইশারা করা
৭। =পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত করে
৮। =স্মরণ।
৯। =নিতাম
১০। =কোথায় (এখানে 'কই)
১১। =বিরহ
১২। =অবিবাহিত (তরুণ)

৬৫। প্রেম পিরীতি ইসারার গুণে
তখে রাইখব ল চইখের কুণে[১]।

৬৬। লিকির-পিকির চইখের পিঁজরাটি
তুই রহইলি কেনে থুবড়াটি[২]।

৬৭। তখে কে দিল ল ঝিলাপি
বুঢ়া বুঢ়া বুঢ়া পাঞ্জাপী।

৬৮। আমরা সিনাব না গা ধুব
তবু তুমার গামছা ভিজাব।

৬৯। তুই কাই পালি কানে সনা[৩]
তর মনে কি নাই বিবেচনা।

৭০ তুই একটা গীতে চুপ দিলি
ছটা গীতে মাথায় হাত দিলি।

৭১। তুই ভালছু কি আড়ে আড়ে
ছানা হলে দিব তর ঘাড়ে।

৭২। তুই ভাত লিবি ভাতার লিবি
ছানা হলে সমান ভাগ লিবি।

৭৩। তর পানে হে ভালইব না
ভালইব যদি মিটিক মারইব না।

৭৪। তর মিটিক মারা ছাড়াব
সুক চইখে ডেলা লাগাব।

৭৫। মকর পরবে
তদের গুঁড়ি কুটি দেই[৪] মরদে।

৭৬। ঘানি ঘুরঘুরাছে
যেমন চুলহায়[৫] বসাই জাল দিছে।

১। =কোণে
২। =অবিবাহিত (তরুণ)
৩। =সোনা
৪। =দেয়
৫। =উনুনে

৭৭। তরা[১] সইয়াই[২] ডাঁঢ়া
তদের দিগে ছাড়ইব ল বয়ায় কাড়া[৩]।

৭৮। তুই ভালছুস কি আড়ে আড়ে
মন যাছে ত আয় পেছা ধইরে।

৭৯। অ বিলাতী তথেই টক করি
আমরা মুসাবনীর[৪] হাট করি।

৮০। মুলা কাইটব ল কুলা কুলা
ছট দেওরা বড় মন ভুলা।

৮১। ছটয় বেহা দিলি যা কেনে
আমি ঝাঁপ দিব নদীর বানে।

৮২। গুহিয়া-বাবলাতলে
অই মাগীরা আসছে ল কত ছলে।

৮৩। তর টাটা যাওয়া ছাড়াব
ডাকগাড়িএ কুলুপ[৫] লাগাব।

৮৪। তুই করছু কেনে লক হাঁসি
কাঁটাবনে বাজইল জড় বাঁশী।

৮৫। তুই ভাবছু কি ল ফুলমণি
কাজ খুইলছে টাটা কম্পানী।

৮৬। তুই কি রে আমার হবি
চিরকালের[৬] ভারাভার লিবি।

৮৭। কাই পালি ল কানপাশা
কানতলে তর উখুনের[৭] বাসা।

১। =তোরা
২। =সয়ে
৩। =পুরুষ মোষ
৪। ধলভূমের একটি শহর
৫। =তালা
৬। =চিরকালের
৭। উকুনের

৮৮। সিলিক[১] শাড়ি কে বলে ভাল
অ যে জলে দিলে হয় কাল।

৮৯। ঢিল[২] ঢেঁকি খালভরার ঘরে
ছানা কাঁদছে ল পিঠার তরে।

৯০। পূর্ন্নিমা[৩] চাঁদের আল[৪]
কিষ্ণ[৫] কাল রাধিকা ভাল।

৯১। ভালছিস কি আর চলছিস কি
যা চলি যা ভালই দেখাছিস।

৯২। টুসুগীতে কে করে মানা
মানা কইরলে লাগবেক রে জরিমানা।

৯৩। মাড়[৬] খাবি ডুভা ডুভা[৭]
সাইকেল চালাই হবি রে কুবা।

৯৪। তুই দেখাইস কি রে ফুটানি
তর পকেটে নাই দুয়ানি।

৯৫। তানা না না না না
মাগী ঠসকে কথা বলিস না।

৯৬। আমি ছুঁই না ছাঁচার খড় বলি
আমার মনটি পালি কি করি।

৯৭। আমরা খাব না শুঁড়ির মুড়ি
শুঁড়ি শুঁড়ি বানাছে মুড়ি।

৯৮। ও তর মকর যাবার তড়বড়ি[৮]
ভাঁইগল লিখা বসইল গরুর গাড়ি।

১। <Silk
২। =শিথিল
৩। <পূর্ণিমা
৪। =আলো
৫। <কৃষ্ণ
৬। <মণ্ড (=ভাতের ফেন)
৭। =বড় বাটি।
৮। =তাড়াতাড়ি

৯৯। আমরা পটকা[2] গাঁয়ের লক বঠি
বাট ছাড়ি দে সতীঘাট যাছি।

১০০। অ পানের খিলি
অত খাইতে কার গালে ছিলি।

১০১। পান খাবি ত পইসা[3] খুল
পান আমার গুলাপ[4] গেঁদা ফুল।

১০২। জাড়া গাছে তাডা লাগাব
তদের পেছু লাগা ছাড়াব।

১০৩। পেছা লাগা ছাড়ইব না
লাগুক টাকা খাতির করইব না।

১০৪। তদের ডুমকা গালে
জড়া ঢেঁকি কুইটবল তালে তালে।

১০৫। তথে নিয়ে যাব চাঁইবাসা
অ ভালবাসা—আরে অ ভালবাসা।

১০৬। চল সজনী আসাম পালাব
খেতে[5] ধান মরিছে কি খাব।

১০৭। তুই দুখ দিলি মাঘ ফাগুনে
সন্নাশাগে[6] বুঢ়া বাইগনে[7]।

১০৮। তরা খাবি যদি দাঁত পাজা
আইজ আম্‌দের সন্নাশাগ ভাজা।

১০৯। চল যাবি ত আমাদের কুল্‌হি
তথে ভাত দিব রে একথালি।

১১০। পকরা[8] পকরা পকরা বাইগনে
তদের মনের কথা কে জানে।

১১১। যাব না হে যাতেও দিব না
আমি ধরইব গলায় ছাড়ইব না।

১১২। তদের পাড়া যাব না ল সই
তদের ডেম্‌রা চইখে কাজল কই।

১। =তাড়াতাড়ি ২। ধলভূমের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ৩। =পয়সা
৪। =গোলাপ। ৫। =ক্ষেতে (=জমিতে)
৬। =সজনে শাকে ৭। =বেগুনে। ৮। =পোকা খাওয়া

১৪০। ভর্তি আছে মধু ফুলেতে
ভ্রমর রস তুমি ভালেতে।

১৪১। মুচকি হাসি গটাই শোর[১]
তর ভাব করা ধরা গেল

১৪২। জলছে আগুন জল ঢালি নিম্‌হা
আমি নাই যাব ল তর সীমা।

১৪৩। ফুল মধু ফুলেই শুখাইল
আমার গুণের বঁধু কাই আইল।

১৪৪। তর গা জ্বালা থামাই দিব
কাঁচা হলইদ ভেলা তেল দিব।

১৪৫। তুই বলিস না মিছা কথা
ফুটি যাবেক ডেমরা চইখ দুটা।

১৪৬। তুই লাগবি নাই লাগ্যে যাব
কঁচি কদম তুল্যে ঘর যাব।

১৪৭। আমার বাইহরাই যাবার মন ছিল
ভাইজ ভাল নাই জুনা[২] রাত হইল।

১৪৮। তর সঁগে যে মিছাই ভাব করা
তর ছানা মায়ড়ায়[৩] ঘর ভরা।

১৪৯। তরা খাইস না ল বনের কচু
কচু খাইলে ছাড়বি নাই পেছু।

১৫০। তুই বাহিরা ল সাঁগা দিব
সিলিক শাড়ী পায়ে মল দিব।

১৫১। তালিস না চইখ ফুটি যাবেক
তথে চইখের অসুদ[৪] কে দিবেক।

১৫২। তথে দেখলে আমার গা জ্বলে
সিনাই লে ল ডভায়[৫] জল আছে।

১৫৩। কই দিলিরে গলা পৈঁচা কই দিলিরে আগবালা
লুলুক দিবার কথা ছিল কই দিলিরে থালভরা।

১। গটাই শোর—চতুর্দিকে জানাজানি। ২। <জ্যোৎস্না
৩। —ছেলে বৌয়ে ৪। —ওষুধ ৫। —ডোবায়

১৫৪। ননদ যাছ গ শশুরবাড়ি
টুকুন দাঁড়াও দণ্ডবৎ করি।

১৫৫। জামা জাকিট পরে
শশুর ঘরে ছিলি ল তুই কি করে।

১৫৬। যেমন পুয়া[১] ধানে খই ফুটে
ভায়ের বন্ধুর তেমনি মুঁহ[২] ছুটে।

১৫৭। আমার ঝিলপি খাতে মন করে
খালভরাদের দামে নাই পটে।

১৫৮। রেল চলে কলে বলে
সাইকেল চলে মরদের বলে।

১৫৯। তরা দেখবি যদি আয় চল্যে
নাচ লাগিছে কদমের তলে।

১৬০। তুই দাঁড়ালি অনেক ধুরে[৩]
নাম জানি নাই ডাইকব কি কইরে।

১৬১। পান খিলিটি ছাগলে খাইল
আমার ফল[৪]কে দিবার মন ছিল।

১৬২। দেখলে তথে হুদকে উঠে মন
অ তুই করলি আমার মন ভরম।

১৬৩। বন্ধু চলে গেলে সাইকেলে
আমায় দেখ না টুকু ভাইলে।

১৬৪। ফুল ফুটেছে মালীর বাগানে
তরা তুলবি না ভাই গোপনে।

১৬৫। বল্লি[৫] আগে শুনলি নাই কেনে
তুই কাঁদবি ল আধাদিনে।

১৬৬। ভালবাসার আশাতে সখী
আমার মন হইল উড়ল পাখী।

১৬৭। কোন খালভরারা ফটকা ফুটাছে
লকের বউ বিটিরা ডরাছে[৬]।

১। =দূরে ২। =বন্ধু (পূর্বে দ্রষ্টব্য) ৩। =বলেছিলাম
৪। =ভয় পাচ্ছে। ৫। =পুরানো ৬। =মুখ

১৬৮। ঝেড়েঙ্গা ঝেঙ্গেং ভাটা মকরে
আমার পা বাঢ়াতে ভয় করে।

১৬৯। অ তর লাজ লাগে না
চেপা নাথে লুলুক পর্‌হা সাজে না।

১৭০। অ তর হাতে আছে অনন্ত
দিনে রাতে উড়ছে কলঙ্ক।

১৭১। নদী ঘাটের বাবুলা[১] তলে
তথে নাচাব তালে তালে।

১৭২। তরা উড়াই দিলি জন্‌হার[২] খই
ভালবাসা রাখতে পারলি কই।

১৭৩। সিনাই লে ল ডভায় জল আছে
অথে দেখলে অকাই[৩] পাছে।

১৭৪। টুকুন ভাব কর
চাই না কড়ি মুঁহে[৪] রা কাঢ়।

১৭৫। বুঢ়া ডিংলা[৫] লতে
জল দিলে ফল ধরে না কন মতে।[৬]

১৭৬। তুই কাল পালি কানে সনা
তর মনে কি নাই বিবেচনা।

১৭৭। অ হে বঁধু
কলকা শিমলের ফুলে নাইথে মধু।

১৭৮। লিবি যদি চুরবালা
চলবি ঢেনি[৭] চাবুকের পারা।

১৭৯। সতীন আমার চালভাজার বালি
আমি না-পারজে[৮] রা কাড়ি।

১৮০। কাতলা মাছের পাতলা তরকারি
তথে ভুলতে যে ল নাই পারি।

১৮১। কাই পালি ল কানপাশা
কানতলে তর উখুনের[৯] বাসা।

১। =বাবলা ২। =ভুট্টা ৩। =বমি ৪। =মুখে
৫। =কুমড়া ৬। =কোনমতে ৭। =লম্বা (মেয়েছেলে)
৮। =অগত্যা. ৯। উকুনের

১৮২। কাইলের মেঘবাদলে
বংশীবদন মিঠাই দিল আঁচলে।

১৮৩। টাটার বিজলি বাতি
বিনা তেলে জলছে গ সারারাতি।

১৮৪। আমি ক চি কদমের কলি
আমি বুঝি না প্রেমের বলি[১]।

১৮৫। বরহাবাজার[২] ভাল
গেঁদা ফুলটি লাড়ি দিলে হয় আল[৩]।

১৮৬। সাদা গায়ে কালি লাগালি
অ[৪] তুই আধা দিনে কাঁদালি।

১৮৭। চল টসু ধন চল বাটে বাটে
টিকিট কাটব ল নদীর ঘাটে।

১৮৮। একলা ঘরে মন কেমন করে
যেমন শোল মাছে উফাইল মারে।

১৮৯। একটি কথা রহিল গ বাকি
তথে ফিরে দেখা পাব।

১৯০। তর গীতের নাই আশ করি
আমরা বাড়ি নামহয় গীতের চাষ করি।

১। =বুলি (=কথা)

২। পুরুলিয়ার একটি শহর। টুসুগীতের ভূগোল ধলভূমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর সর্বত্রই এর বিহারভূমি। এক অঞ্চলের গান অন্য অঞ্চলে সহজেই ছড়িয়ে পড়ে—পার্থক্য যদি কিছু থাকে তবে তা শব্দ-প্রয়োগগত অথবা উচ্চারণগত, অন্য কিছু নয়।

৩। =আলো

৪। =ও।

এই লেখকের ঃ

ধলভূমের লোকগীতি

(প্রথম খণ্ড : বাঁদনা)

ভূমিকা : ডঃ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

"ধলভূম অঞ্চলের লোকজীবন থেকে বহু পরিশ্রমের বিনিময়ে চিত্তরঞ্জনবাবু এই সব উপাদান সংগ্রহ করে লোকগীতির পরিধি প্রসারিত করেছেন। এ জন্যে তিনি ধন্যবাদার্হ।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

"বইটিতে গো-জাতি সম্বন্ধে যে চমৎকার নৃতাত্ত্বিক ও লৌকিক তথ্য ও তত্ত্ব আছে তা লোকবিজ্ঞানীদের বিশেষ কাজে লাগবে। সংগ্রহ অত্যন্ত মূল্যবান এবং নির্ভরশীল ; টীকা ও ব্যাখ্যাও মূল্যবান।"
—ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী
মহাপরিচালক বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ।

"একান্ত তথ্যনির্ভর আলোচনাও যে কত উপাদেয় হতে পারে এই বইখানি তার প্রমাণ।" —ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

"বইখানি মূল্যবান। এই বই অন্যকে পথ প্রদর্শন করবে।"
—অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েন
সভাপতি, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

"ভূমি-ভিত্তিক আদি জনগোষ্ঠীর বংশধর, যারা প্রকৃতই মাটির সন্তান তাদের প্রত্যক্ষ রূপটি, বিশেষ করে কৃষিকেন্দ্রিক রূপটি অকৃত্রিমভাবে ফুটে উঠেছে। পড়ে আনন্দ পেলাম।" —ডঃ শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য
উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

"ভাষা অত্যন্ত সরল। লৌকিক ও আঞ্চলিক শব্দের টীকা-টিপ্পনী বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে। বহু প্রাচীন 'ধেজুয়ান' বা অহিরাগানের সঙ্কলন বইটিকে তথ্যপূর্ণ করে তুলেছে।" —দেশ।

"এক ঐতিহ্যপূর্ণ গৌরবময় জীবনের স্বর্ণদ্বার আমাদের সামনে খুলে দিয়েছেন শ্রীসাহা। তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ঔৎসুক্য ও সর্বোপরি সাধনা তাঁকে এ মহান কাজে সাফল্য দান করেছে।" —ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

"গানগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটি অঞ্চলের ধর্ম-সংস্কৃতি-আচার-অনুষ্ঠানের অনেক অজ্ঞাত বিষয় উদ্‌ঘাটিত।"
—ডঃ শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য।
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

পাঁচ টাকা

এ. কে. সরকার এণ্ড কোং
১/১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩